স্বপ্ন-শেষ

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম্‌-এ



১৩৩৭

মূল্য দেড় টাকা

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্

—হইতে—

শ্রীসবিতা রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১-সি, লেক্ রোড, কালীঘাট,

কলিকাতা

নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

—হইতে—

শ্রীকালীপদ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

৬নং চালতাবাগান লেন,

কলিকাতা

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্ হইতে প্রকাশিত

—অন্যান্য গ্রন্থ—

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

জমা-খরচ	১॥০	বরদা-ডাক্তার	১৲
স্ত্রী	১।০	মুক্তাঝারি	১।০

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত

ঘূর্ণি (উপন্যাস)	১॥০

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবলী হইতে সঙ্কলিত

—আদর্শ চয়ন-গ্রন্থ—

আহরণী		২৲
ঋতুমঙ্গল	(২য় সংস্করণ)	৸৹
বল্লরী	(৩য় ঐ)	॥০
রসকদম্ব	(কমিকগানের বই)	॥৵০
লাজাঞ্জলি		॥৵০
ক্ষুদকুঁড়া		॥০
পর্ণপুট ১ম	(৪র্থ সংস্করণ)	১।০
পর্ণপুট ২য়	(২য় ঐ)	১।০
ব্রজবেণু	(২য় ঐ)	১৲

প্রাপ্তিস্থান—রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্

১-সি, লেক্ রোড, কালীঘাট

বরেন্দ্র লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

দক্ষিণ-কলিকাতার সাহিত্য-সেবকগণের মিলন-সংসদ্

রসচক্রের

রসজ্ঞ সদস্যবৃন্দের করকমলে।

স্বপ্ন-শেষ

১

গোটা দুপুরটা এবং অর্দ্ধেকটা বৈকাল দিবানিদ্রায় কাটাইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিবারণচন্দ্র হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া, 'আলিস্যি' ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং নরম একটা বালিস কোলের উপর তুলিয়া লইয়া সুমুখের খোলা জানালাটার ভিতর দিয়া নিদ্রালস চক্ষু দুটির অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা অলসদৃষ্টি বাহিরের দিকে মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

জানালাটার কোলেই একটা সরু গলি এবং তার পরেই একটি জীর্ণ সংস্কারবিহীন দোতালা বাড়ীর ইট-বারকরা পুরাতন দেয়াল, এবং তাহাতেই সংলগ্ন একটা সেকেলে ধরণের আলকাতরা-মাখান ছোট্ট ভাঙ্গা জানালা—তাও বন্ধ। সুতরাং অলস নিবারণচন্দ্রের অলসতর চক্ষুদুটির বেশীদূরে চলিয়া গিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবার বিশেষ ভয় ছিল না।

—স্বপ্ন-শেষ—

আজ সকাল হইতেই বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। নিবারণচন্দ্র আহারান্তে দ্বিপ্রহরে শয্যায় গিয়া যখন শুইয়া পড়িয়াছিল, তখন আকাশটা একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল; কিন্তু আকাশটা সেদিন সত্যসত্যই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল কিনা তাহা আর নিবারণচন্দ্রের দেখা হয় নাই। তারপর একেবারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই কিছুক্ষণ হইল চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিয়া সে দেখিল—আকাশটা আস্তই রহিয়া গিয়াছে,—কিন্তু, তখন পর্য্যন্ত ভিজে ভিজে; অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া কেহ যদি চুপ করে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার চোখের পাতা দুটো যেমন ভারি-ভারি এবং ভিজে-ভিজে দেখায়, অনেকটা সেই রকম। সুমুখের ভাঙ্গা জানালাটা দিয়া তখনও অল্প অল্প জল চোঁয়াইতেছিল এবং জানালাটার কোলের কার্ণিশের ফাটলে যে শিশু অশ্বত্থ গাছটি আজ বছর খানেক হইল ভূমিষ্ঠ হইয়া অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহারি কচি কচি পাতা এবং সরু সরু ডালগুলি সারাদিন জলে ভিজিয়া ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যার জ'লো হাওয়ায় শির্ শির্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নিবারণ চুপ করিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আজ বছর খানেক হইল নিবারণচন্দ্র তার পূর্ব্বের বাসা ছাড়িয়া এই নূতন বাসাটিতে উঠিয়া আসিয়াছে, এবং বছরখানেক ধরিয়া সে সুমুখের এই ভাঙ্গা বাড়ীটার ইট-বারকরা জীর্ণ দেয়াল এবং তাহার গায়ে-বসান জীর্ণতর এই বদ্ধ জানালাটার দিকে

চাহিয়া চাহিয়া এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, ইহার দিকে চাহিয়া একটিমাত্র চিন্তাকেও মনের ত্রিসীমানায় আসিতে না দিয়া সে বোধ হয় একটা গোটাদিন পরম নির্ব্বিকারভাবে কাটাইয়া দিতে পারিত। তার নিঃসঙ্গ কর্ম্মহীন, দায়িত্বহীন, নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা এবংএই জনপ্রাণিহীন লোক-কোলাহলশূন্য, নির্জ্জন খালি বাড়ীটার অলস, নির্জ্জন, উদ্দেশ্যশূন্য অস্তিত্বের মধ্যে কোথায় যেন বেশ একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র ছিল। আজ একবৎসর ধরিয়া এই বাড়ীটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিবারণ দেখিয়া আসিতেছে একটিবারের জন্যও সুমুখের সেই জানলাটা খোলা ত দূরের কথা, একটু নড়িলও না, একটিবারের জন্যও একদিন কাঁপিয়া উঠিল না। কেবল বাদলার দিনে, দুর্য্যোগের রাতে যেদিন তার মত নীরস, নিরর্থক একঘেয়ে জীবনটার মাঝখানেও হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য কে আসিয়া যেন নাড়া দিয়া চলিয়া যায়, সেইদিন কেবল এই ভাঙ্গা নির্জ্জন খালিবাড়ীটার ঐ জীর্ণ ছোট্ট ভাঙ্গা জানালাটা মাঝে মাঝে খট্ খট্ করিয়া নড়িয়া উঠিত।

কিছুক্ষণ সেইভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিবারণ অলস এবং জড়িতকণ্ঠে ডাকিল—"বেহারী!" কিন্তু কোন সাড়া আসিল না। গলার স্বরটাকে অতিকষ্টে আর একটু জোর করিয়া লইয়া সে আবার ডাকিল—"বেহারী!"—তথাপি কোন সাড়া আসিল না। ধীরে ধীরে কোলের উপর হইতে বালিসটা শয্যার উপর নামাইয়া রাখিয়া নিবারণ উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ একটা খট্ খট্ শব্দে চমকিয়া উঠিয়া, সেই

ভাঙ্গা বাড়ীটার দিকে চাহিয়াই কি মনে করিয়া সে নিশ্চল হইয়া আবার বসিয়া পড়িল। তার মনে হইল এতদিনের সেই বন্ধ জানালাটা ভিতর হইতে কিসের আকর্ষণে সহসা যেন নড়িয়া উঠিল,—সে অবাক হইয়া সেই দিক পানে চাহিয়া রহিল। তার বুকটা কেন কে জানে যেন ভিতর হইতে দুর দুর করিয়া উঠিল,—কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। অকস্মাৎ অস্বাভাবিক আকস্মিক কিছু একটা চোখের সুমুখে ঘটিতে দেখিলে লোকে যেমন স্তম্ভিত হইয়া সেইদিক পানে একদৃষ্টে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া থাকে, সে ঠিক সেইভাবে ঘনায়মান সন্ধ্যার আলো ও ছায়ার আবছায়ার মধ্যে ভূতাবিষ্টের মত একদৃষ্টে সেই জানালাটার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ ধরিয়া খট্ খট্ শব্দ করিয়া নড়িয়া চড়িয়া হঠাৎ এক সময় জানালাটা সত্যসত্যই তার চোখের সুমুখে আজ খুলিয়া গেল। তার পরেই দেখা গেল, এই এতদিনের বন্ধ জীর্ণ নিঃশব্দ জানালাটার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি সুন্দরী কোমলাঙ্গী বালিকা আর তার কোলে একটি তেমনই সুন্দর নিটোল নধর শিশু,—পরিপূর্ণ প্রাণ-প্রাচুর্য্যে টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করিতেছে। সেই দিক পানে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া নিবারণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং হঠাৎ অত্যন্ত জোরে চেঁচাইয়া উঠিল, "বেহারী—এই বেহারী!" নীচের উঠান হইতে উত্তর আসিল—"আজ্ঞে!" এবং সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়াইতে

দৌড়াইতে বেহারী আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইল,—তার চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। নিবারণচন্দ্রকে সে অনেকদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাকে চেঁচাইয়া কথা বলিতে বা ধমকাইতে সে বড় একটা দেখে নাই ; আজ হঠাৎ তাহাকে এরূপ ভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিতে শুনিয়া বেহারী বেশ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল—সে তটস্থ ভাবে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবু!"

স্বাভাবিক নরম সুরে নিবারণ বলিল—"তামাক সেজে ঘরে দিয়ে আয় দেখি!"—কথাটা শেষ করিয়াই দড়িতে ঝোলান একটা গামছা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া চটিজোড়ার মধ্যে পাছুটো প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিবারণ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মুখ হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া নিবারণচন্দ্র যখন চটিজোড়াটা চৌকাঠের বাহিরে ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুমুখের বাড়ীর সেই জানালাটার দিকে চাহিয়া সে দেখিল, সেই জীর্ণ ভাঙ্গা জানালাটা কখন এক সময়ে আবার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সমস্ত দিনব্যাপী দুর্য্যোগের ঘনান্ধকারপূর্ণ কালো মেঘের গুমোট ভাঙ্গিয়া একটা মলিন ছিন্ন মেঘের বাতায়নের ধারে কখন একসময় চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—প্রতিপদের চন্দ্রখানি—নির্ম্মল, নিটোল, শুভ্র।

২

নিবারণচন্দ্রের বয়স হইয়াছে,—তা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু আজও সে অবিবাহিত। অনেকেই বিবাহ করে না পয়সার অভাবে; নিবারণচন্দ্রের কিন্তু পয়সার ভাবনা আদবেই ছিল না। তার বাপ ৺গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই একমাত্র বংশধরটির জন্য দেশে যে প্রকাণ্ড জমিদারী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার আয়ে একটি কেন দশটি বিবাহ করিলেও নিবারণকে অন্নের চিন্তা কোন দিনই করিতে হইত না,—কিন্তু তথাপি সে বিবাহ করিল না।

নিবারণ ছেলেবেলা থেকেই বড্ড বেশী অলস—দেহে এবং মনে। তার আর একটি স্বভাব ছিল, সে ভুলিয়াও কখন কোনরূপ ঝঞ্ঝাট বা গোলমালের দিকে ঘেঁসিতে চাহিত না। ছেলেবেলায়, যে সময় তাহারি সমবয়স্ক সঙ্গীরা ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, সেই সময় বালক নিবারণচন্দ্র সকলের অজ্ঞাতসারে চুপি চুপি কখন সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত—পাছে ছুটাছুটি

করিতে গিয়া হাত-পায়ে আঘাত লাগে। ছেলেবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাকে কেহ কখন জোরে হাঁটিতে বা জোরে কথা বলিতে শুনে নাই। দুনিয়ার যতকিছু ঝঞ্ঝাট এবং গণ্ডগোল হইতে নিজেকে কোনও রকমে বাঁচাইয়া যাওয়াই ছিল তার জীবনের একমাত্র কাজ।

তারপর বাল্য কাটাইয়া নিবারণ হঠাৎ একদিন যৌবনে পদার্পণ করিল, কিন্তু সুখ অপেক্ষা সোয়াস্তির ভিখারী এই অলস নির্জ্জীব প্রাণীটির মনের গতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন বাহির হইতে লক্ষ্য করা গেল না। সঙ্গী সে বাল্যেও ভালবাসিত না, যৌবনেও ভালবাসিতে শিখিল না। বড়লোকের ছেলে, সুতরাং গ্রামের অনেকেই আসিয়া চারিপাশে ঘিরিয়া রাখিবার বিধিমত চেষ্টা করিল।—বয়স অল্প, মাথাটাও কাঁচা সুতরাং চর্ব্বণ করিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না—এমনিটাই ছিল তাহাদের ধারণা, কিন্তু দাঁত ফুটাইতে গিয়া তাহারা দেখিল,—সকলের অজ্ঞাতসারে অল্প বয়সেই এই কচি মাথাটা কখন এক সময় শুকাইয়া, পাকিয়া একেবারে ঝুনা হইয়া গিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল ছেলেবেলায় যে লোকটা ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিয়া হাত পা ভাঙ্গিবার ভয়ে তাহাদের কাছ হইতে সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতে চাহিত, আজ আসন্ন যৌবনের স্বপ্নময় ক্ষণটিতে তক্তাপোষের উপর অলসভাবে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া খোসগল্প এবং আরও পাঁচরকম ফষ্টি-নষ্টি করিবার বেলায় সেই লোকটাই সাগ্রহে তাহাদিগকে আহ্বান করিবে; কিন্তু এখানেও সে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল

এবং তাহাদের ভয়ে অন্দরে গিয়া সেই যে গা ঢাকা দিল, তার পর হইতে তার টিকিটি পর্য্যন্ত কেহ আর দেখিতে পাইল না।

অল্প বয়সেই নিবারণের মার মৃত্যু হয়। সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল, বৃদ্ধ গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁরই দূর সম্পর্কীয় এক বৃদ্ধা ভগিনী। গোবিন্দচন্দ্রের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু কেহই বেশী দিন টিঁকিয়া থাকে নাই। অবশেষে অসংখ্য সন্ন্যাসীর জটা নিংড়ান জল, পিরের দরগার চৌকাঠের মাটি, নানান জানোয়ারের নখর, শৃঙ্গ এবং খুর, নানান জাতীয় অদ্ভুত অদ্ভুত বৃক্ষের অদ্ভুততর শিকড় এবং তাহার উপর অসংখ্য মাদুলি, কবচ ও তাবিচের গুণেই হৌক বা অন্য যে কারণেই হৌক অবশেষে নিবারণচন্দ্র সত্য সত্যই টিঁকিয়া গেল। কিন্তু মৃত্যুর দেশ হইতে জোর করিয়া কবচ ও মাদুলি দিয়া বাঁধিয়া ফিরাইয়া আনা এই ছেলেটি বাঁচিয়া থাকার দেশে আসিয়াও মরণের দেশের অনেকখানি আবহাওয়া নিজের চারিদিকে ধরিয়া রাখিল, এবং বাঁচিয়া থাকিয়াও যে সকল লক্ষণ দেখাইতে লাগিল তাহা সজীব অপেক্ষা নির্জ্জীব পদার্থের মধ্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

এহেন নিবারণচন্দ্রের বয়স যখন ২১ কি ২২, সেই সময় গোবিন্দচন্দ্রের হইল স্বর্গলাভ, এবং সমস্ত জমিদারীটা একরাশ ঝঞ্ঝাট ও দায়িত্ব পশ্চাতে লইয়া তার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য হঠাৎ একমুহূর্ত্তে থাবা মেলিয়া

দাঁড়াইল। গোবিন্দচন্দ্রের অন্তরঙ্গ এক উকিল বন্ধু ছিল। লোকটী প্রবীণ, বিচক্ষণ এবং সৎ। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁর বেশ পশার এবং নামডাক ছিল। মামলামোকর্দ্দমা বা বিষয় সংক্রান্ত কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলেই গোবিন্দচন্দ্র তাঁর এই উকিল বন্ধুটির শরণাপন্ন হইতেন। আজ এই দুর্দ্দিনে নিবারণ তাঁহাকেই চিঠি লিখিয়া দেশে আনাইল, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ে ধরিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। পিতৃবন্ধু অটল, তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন,—

"অত অধীর হ'লে ত চলবে না বাপু! তোমাকেই ত এতবড় জমিদারীটার সমস্ত ভার আজ থেকে ঘাড়ে নিতে হবে, এখন থেকে শক্ত না হলে চলবে কেন!"

নিবারণ এবার সত্যসত্যই হতাশ হইয়া পড়িল; সে অটলের পা-দুটো জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচ বৎসরের শিশুর মত করিয়া ডুগরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"আমাকে বাঁচান কাকাবাবু, আমি ওসব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারবো না।"

অটল ধমকাইয়া উঠিলেন—"পারবো না কি রকম? তবে কি পৈতৃক জমিদারীটা একবারে বরবাৎ করে দিতে চাও?" নিবারণ আর কোন কথা বলিল না, সে হতাশ ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অটলের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিচক্ষণ অটলচন্দ্র বুঝিলেন, ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচজনের সহিত পরামর্শ করিয়া নিকটবর্ত্তী আর একটী জমিদারের নিকট নিবারণের সমস্ত

এবং মাটকোঠা। এখানে আসিয়া সে কয়েক বৎসর পরম নিশ্চিন্ত ভাবে, নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া দিল।

বিবাহের বয়স তার অনেক দিনই হইয়াছিল—অর্থের অভাবও ছিল না, তথাপি নিবারণ বিবাহ করিল না—পাছে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়া যায়। পাড়ার লোকে তাহার সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করিতে আসিলে সে যেমন চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইত, সে বাড়ী নাই—পাছে ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয়,—ঠিক তেমনি করিয়াই তার বক্ষের দরজায় নবযৌবন যখন আসিয়া ঘা মারিতে লাগিল, সে ভিতর হইতে বলিয়া পাঠাইল—"বাড়ী নাই—বাড়ী নাই!"

বিবাহ করাতে হয়ত সুখ আছে কিন্তু সোয়াস্তি কোথায়? অর্থের জন্য তাহাকে না হয় মাথা ঘামাইতে হইল না; কিন্তু তার পর? অর্থ দিয়া চাল ডাল কেনা যাইতে পারে কিন্তু দায়িত্ব, দুশ্চিন্তা, রোগ, শোক, এ সকলের হাত হইতে নিষ্কৃতি, সে ত আর অর্থ দিয়া কেনা যায় না; সুতরাং নিবারণচন্দ্র ঠিক করিল, জীবনে সে কখন বিবাহ করিবে না, এবং যেমন আছে ঠিক এমনি ভাবেই সারাটা জীবন পরম নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার ভাবে আহার করিয়া এবং নিদ্রা দিয়া কাটাইয়া দিবে, এবং ইহারই মধ্যে যেটুকু নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্য তাহার সাধ্যায়ত্ত, তাহা সে ষোল-আনার যায়গায় আঠার-আনা ভোগ করিয়া লইবে, যথা—বাদলার দিনে খিচুড়ি ও ইলিসমাছভাজা, শীতের দিনে গলদা চিংড়ি ও ফুলকপি, গ্রীষ্মের দিনে ল্যাংড়া আম—

এমনি আরো কত কি,—তার উপরআছে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, এবং তারও উপর আছে মধ্যে মধ্যে বায়স্কোপ দেখিতে যাওয়া, সুতরাং অলম্‌ অতিবিস্তরেণ।

যাক্‌, এইভাবে বাড়ীর পর বাড়ী বদলাইয়া আরও ২০টা বৎসর আহার করিয়া, ঘুমাইয়া, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িয়া এবং মধ্যে মধ্যে বায়স্কোপ দেখিয়া কাটাইয়া, আজ একবৎসর হইল সে এই নূতন বাড়ীটিতে উঠিয়া আসিয়াছে। বয়স তার এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু মাথায় টাক পড়ায় এবং সুমুখের কয়েকটা দাঁত সকাল সকাল পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে দেখিলে ৬০ বছরের কম বলিয়া মনে হয় না।

এই নূতন বাড়ীটিতে উঠিয়া আসিয়া অবধি একটা বৎসর সে বড়ই শান্তিতে কাটাইয়াছে। বাড়ীটি একটি সরু গলির মধ্যে; সুতরাং গাড়ীঘোড়ার ঘড়্‌ঘড়ানির বালাই নাই; তাহার উপর সুমুখের যে বাড়ীটা হইতে সে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়াছিল, কিছুদিন পরেই জানিতে পারিল সে বাড়ীটি আজ কয়েকবৎসর ধরিয়া খালি পড়িয়া রহিয়াছে, এবং আরও কতবৎসর যে এই ভাবেই খালি পড়িয়া থাকিবে তাহারও কোন ঠিকঠিকানা নাই। বাড়ীটির দুই সরিকে মামলা চলিতেছিল, এবং এই মামলার ফলে কোন পক্ষ যে এই বাড়ীর মালিক হইবেন তাহারও কোন স্থিরতা ছিলনা।

ফলে বাড়ীটি খালিই পড়িয়া রহিল, এবং একে অনেককেলে পুরাতন বাড়ী, তাহার উপর অনেক দিন যাবৎ সংস্কার

না হওয়ায় দিন দিন জীর্ণ-দীর্ণ হইয়া কঙ্কালসার হইয়া পড়িতে লাগিল। সে যাহাই হৌক, এই ভগ্ন-জরাজীর্ণ বাড়ীটির কাছ হইতে কোনরূপ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা না থাকায় নিবারণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এবং তার শয়নকক্ষের বাতায়ন পথে ইহারই রুদ্ধ ভগ্ন জানালাটির দিকে চাহিয়া পরম নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার ভাবে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল।

৩

যেদিন সন্ধ্যায় নিবারণচন্দ্র প্রথম আবিষ্কার করিল, সুমুখের ঐ ভাঙ্গাবাড়ীর ভাঙ্গা জানালাটা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায় নাই, ঠিক তার পর দিন সকাল ৯টা আন্দাজের সময় সে বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িতেছিল। গভীর রাত্রে অন্ধকারপূর্ণ একটা সরু গলির মধ্যে গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয়ের কানের পাশ দিয়া এই কিছুক্ষণ হইল উপরিউপরি তিনটি গুলি শন্ শন্ শব্দে ছুটিয়া গিয়াছে। উত্তেজনা উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কায় নিবারণচন্দ্রের একেবারে দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম, এমন সময় সেই কক্ষে একটি দশ এগার বৎসরের বালিকা প্রবেশ করিল—কোলে তার মোটাসোটা একটি উলঙ্গ শিশু। নিবারণ কিন্তু ইহার কিছুই টের পাইল না, সে তখন ডিটেক্‌টিভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কল্পনায় অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া কোন কথা না বলিয়া প্রথমেই ছেলেটিকে তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিল,

তারপর কোমরের কসিটা শক্ত করিয়া আঁটিয়া লইল। তখনও নিবারণচন্দ্র সেই ভীষণ স্থান হইতে ফিরিয়া আসে নাই এবং গোয়েন্দাপ্রবর বীরবর দেবেন্দ্রবিজয়ের জীবন তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। সুতরাং নিবারণচন্দ্র কিছুই জানিতে পারিল না। মেয়েটি এই মোটাসোটা ভারি ছেলেটাকে এতটা বহিয়া আনিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল,—কাপড়টাকে ঠিক করিয়া পরিয়া লইয়া সে তক্তপোষের একপ্রান্তে ছেলেটির পাশে ধীরে ধীরে বসিল।—কিন্তু গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় তখন পর্য্যন্ত শত্রুকবলে—জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে।—এমন সময় হঠাৎ মেয়েটির অসাবধানতায় শিশুটি তক্তপোষের উপর হইতে সশব্দে মেঝের উপর মুখ ঠুকিয়া পড়িল, এবং তারপরই এই দস্যি শিশুটি এমনি বিকটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল যে, গোয়েন্দা দেবেন্দ্র-বিজয়কে শত্রুকবলে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া নিবারণচন্দ্রকে লাফাইয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িতে হইল। মেয়েটি শশব্যস্তে ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল এবং নানাপ্রকারে তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিবারণচন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। এক মুহূর্ত্তে গতকল্যকার সেই জানালা খোলার অপূর্ব্বতা তার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। ছেলেটি একটু শান্ত হইলে নিবারণ জিজ্ঞাসা করিল—বড্ড লেগেছে কি? মেয়েটি তাহাকে কোলে করিয়া ঘরময় পাচারি করিতে করিতে বলিল—"না, তেমন বেশী লাগেনি।" ছেলেটি কিছুক্ষণ ফোঁপাইয়া

অবশেষে শ্রান্ত হইয়া তার দিদির কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মেয়েটি অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাহাকে তক্তপোষের উপর শোয়াইয়া দিল, এবং তক্তপোষের উপর হইতে তালপাতার একটা পাখা কুড়াইয়া লইয়া তাহার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাওয়া করিতে করিতে নিবারণের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনাদের বাড়ীর মেয়েরা বুঝি দেশে চলে গেছেন ?"

নিবারণচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া হতভম্বের মত এই মেয়েটির কার্য্যকলাপ দেখিয়া যাইতেছিল; এ অবস্থায় কেমন করিয়া সে যে এই সম্পূর্ণ অপরিচিতা বালিকাটির সহিত আলাপ করিবে তাহা তার মাথায় কিছুতেই জোগাইতেছিল না—অথচ চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটাও যে নেহাৎ অশোভন হইতেছে তাহাও সে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল,—এমন সময় মেয়েটি নিজেই প্রথমে কথা কহিয়া তাহাকে প্রকাণ্ড একটা সমস্যা-সমাধানের গুরুভার হইতে বাঁচাইয়া দিল।

ঘাড় চুলকাইয়া—দু'চারবার ঢোক গিলিয়া লইয়া নিবারণ উত্তর দিল, "মেয়েরা ত কেউ এ বাড়ীতে থাকে না।"

মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁরা সব দেশে থাকেন বুঝি ?"

নিবারণ অনেক কষ্টে এই মেয়েটিকে বুঝাইয়া দিল যে, এ দুনিয়ায় সে একা, এবং তাহার সহিত স্ত্রীলোকের সম্পর্ক তার মার মৃত্যুর পর হইতে একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। মেয়েটি

দুঃখের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, এবং এই দায়িত্বটুকু যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না—তাহার মনকে একেবারে অলস এবং একঘেয়ে হইয়া পড়িয়া থাকার দুর্গতি হইতে অনেকখানি বাঁচাইয়া দিয়াছে।

৪

একদিন সুভার বাপের সহিত নিবারণের হঠাৎ আলাপ হইয়া গেল। যদিও নিবারণচন্দ্র ইহা আদবেই চায় নাই এবং এই পরম আকস্মিক ঘটনাটি যে কোনদিন ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে সে সচেতনও ছিল না। লোকটি বয়সে নিবারণ অপেক্ষা কিছু ছোট হইবে। সেদিন রবিবার, হাতে একটা চটের থলে লইয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে গোলগাল ছোটোখাটো গৌরবর্ণ এই লোকটি বাজার করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ নিবারণের বাইরের ঘরের জানালাটার ভিতর দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই একেবারে অনর্গল বকিতে সুরু করিয়া দিল—"নমস্কার মশাই, আপনি বোধ করি আমাকে চিনতে পারছেন না, আর চিনবেনই বা কি করে?—প্রথমতঃ, মশায় ত বাড়ীর বারই হন্ না, দ্বিতীয়তঃ, আমরা হচ্ছি গরীব-গুর্ব্বো লোক,—তা যাক্, আমার আজ ভাগ্যি বলতে হবে যে, মহাশয়ের মত মহৎব্যক্তির দর্শন লাভ হোলো।"

ইহার উত্তরে কি যে জবাব দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নিবারণচন্দ্রের মাথায় জোগাইল না—সে হাঁ করিয়া এই অপরিচিত লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আগন্তুক লোকটি ইতিমধ্যে নিঃশেষপ্রায় বিড়িটায় শেষটান দিয়া সেটাকে জানালা গলাইয়া রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার বকিতে সুরু করিয়া দিল—"মহাশয়ের বাড়ীর গায়েই এ গরীবের বাস,—কিন্তু এ যাবৎ একদিনও মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন কপালে ঘটে উঠ্‌লো না; ন'টার মধ্যে নাকে কাণে গুঁজে বেরুতে হয় মশাই, আর ফিরতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। পথটি ত আর সোজা নয়,—কোথায় চোরবাগান আর কোথায় খিদিরপুর ডক—বুঝুন, মশাই ঠেলাখানা একবার। আজ রবিবার পেলুম, বেরুবার তাড়া নেই, বেলায় বাজার করতে যাচ্ছিলুম, দেখলুম, মশাই ব'সে রয়েছেন, ভাবলুম এই সুযোগে আলাপটা ক'রে রাখতে দোষ কি। তা মশায়কে বিরক্ত করছি না বোধ হয়, কি জানেন দাদা, আমরা হচ্ছি গরীব-গেরোস্ত লোক আর আপনারা হচ্ছেন—" কথাটাকে সমাপ্ত হইতে না দিয়াই লোকটা হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার মেয়ে সুভার কাছে আপনার সব কথাই শুনতে পাই; মেয়েটা ত মশাই আমাদের একরকম পর ক'রে দিতে বসেছে।" এমনিভাবে আধঘণ্টাটাক্ অনর্গল বকিয়া এবং উত্তরে দু একটা 'হাঁ' কিম্বা 'না' মাত্র পাইয়া সুভার বাপ শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম গাঙ্গুলী সেদিনকার মত বিদায় লইল, এবং নিবারণচন্দ্র সেদিন স্নান করিবার পূর্ব্বে

অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাণ্ডা তিলের তৈল ব্রহ্মতালুতে ঘসিয়া ঘসিয়া মাখিল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদি সারিয়া নিবারণ শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল—একটু একটু তন্দ্রাও আসিতেছিল,—এমন সময় স্বভা আসিয়া ডাকিল—"দাদামশাই!"

ধীরে ধীরে নিবারণ উত্তর দিল—"কি দিদি!"

শয্যাপ্রান্তে নিবারণের মাথার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্বভা বলিল, "তুমি লোকের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পার না কেন দাদামশাই?"

ব্যাপারটা বুঝিতে নিবারণের বেশী দেরী হইল না—সেও একটু হাসিয়া উত্তর দিল—"একথা বলছিস্ কেন রে পাগলী,—কেন তোর সঙ্গে ত আমি রাত দিনই বক্‌ছি।"

"আমার সঙ্গে ত খুব ব'কো, কিন্তু আর কারুর সঙ্গে কথা কইতে পার না কেন? বাবা মার কাছে বলছিল, তুমি বড় লোক কিনা তাই গরীবদের সঙ্গে কথা কইতে চাও না। আমি কত ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে, আমার দাদামশাই সে রকম লোক নয়, লোকে ভুল বোঝে,—তারা বিশ্বাসই করলে না! তুমি আমার সঙ্গে যেমন কথা কও, তেমনি সকলের সঙ্গে কইলেই ত আর কেউ কিছু বলতে পারে না—না, সত্যি সত্যি তুমি আর ওরকম করো না। দাদামশাই—লোকে নিন্দে করবে যে!"

নিবারণচন্দ্র বালিকার এই উপদেশ কতখানি শুনিল তাহা ভগবানই জানেন;—কেহ নিন্দা বা সুখ্যাতি করিলে তাহার যে

কি পরিমাণে ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও সে যে কতদূর হিসাব করিয়া দেখিল তাহাও জানেন সেই অন্তর্য্যামী। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালিকাটি যে তাহার নিন্দা শুনিয়া ব্যথিত হইয়া একবুক সহানুভূতি এবং দরদ লইয়া তার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহারই পরম তৃপ্তিটি সে চোখ বুজিয়া নীরবে কিছুক্ষণ ভোগ করিয়া লইল।

৫

ইহার পরের রবিবারে ঘনশ্যাম আসিয়া আলাপ জমাইয়া তুলিবার যোগাড় করিতেই নিবারণ হঠাৎ এমনই অস্বাভাবিক ভাবে বকিতে সুরু করিয়া দিল, যে সে নিজেই নিজের ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সুভার বাপ এবার তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিলেই সে যে করিয়া হউক প্রমাণ দিবে যে, সে ভদ্রলোকের সহিত অনায়াসে নির্ভয়ে কথা কহিতে পারে এবং এই অসম-সাহসিকের কার্য্যে সে কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে কম যায় না ;—সুতরাং সে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমটা সে কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কি কথা সে কহিবে।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন নিবারণবাবু!"

সে উত্তর দিল—"হুঁ!"—ইহার অধিক কি উত্তর সে দিবে?

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়ের বুঝি বাড়ী থেকে মোটেই বেরুনো হয় না?"—সে বলিল—"না, মাঝে মাঝে বেরুই ত!"—ইহার বেশী আর কি বলা যাইতে পারে?

মনে মনে সে মহাবিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় ঘনশ্যাম আবার কথা তুলিল—"মহাশয়ের পয়সার ত আর অভাব নেই, একটা মোটর কেনেন না কেন? দিব্যি বিকেলের দিকটা গড়ের মাঠের দিকে একটু—" আর পায় কে?—নিবারণ কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই হঠাৎ কবে বায়স্কোপে মোটর ডাকাতির কি একটা পালা দেখিয়াছিল, তাহারই মূল গল্পটা অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে বকিয়া যাইতে সুরু করিয়া দিল—যদিও ঘনশ্যামের প্রশ্নের সহিত এই গল্পটির বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। মৌখিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে ইস্কুলের ছেলেরা ইতিহাসের একটা গোটা যুদ্ধের বিবরণ যেমন চোখ কান বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কোনও রকমে আওড়াইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, ঠিক তেমনি করিয়া মিনিট দশেকের মধ্যে একটা গোটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কোনও মতে উগরাইয়া দিয়া নিবারণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এবং ইহার পর সে যদি একটি কথাও আজ না বলে তাহা হইলেও কেহ তাহার দোষ ধরিতে পারিবে না। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া সে শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে তাকিয়াটায় হেলান দিয়া চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

ঘনশ্যাম বলিল—"বাঃ, আপনি ত দিব্যি গল্প জমাতে পারেন মশাই!"

সে চক্ষু মুদিয়াই উত্তর দিল—"হুঁ!"

ঘনশ্যাম আবার বলিল—"তা যাই বলুন নিবারণবাবু, আপনার কিন্তু একটা মোটর কেনা নিতান্তই দরকার।"

নিবারণ—'হুঁ' 'না' কিছুই বলিল না।

ঘনশ্যাম বলিল—"আপনার তন্দ্রা আসছে বুঝি?—তা হলে বিরক্ত করবো না—আজ নমস্কার তা হলে—" তার পরই হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, একটা কথা বলছিলুম—গোটা ত্রিশেক টাকা যদি কিছু দিনের জন্যে—"

নিবারণ সেই ভাবেই চক্ষু মুদিয়া জড়িতকণ্ঠে ডাকিল—"বেহারী!" বেহারী অসিয়া উপস্থিত হইল।

"আমার ঘর থেকে ক্যাশবাক্সটা নামিয়ে নিয়ে আয় ত—" বলিয়া নিবারণ আবার চক্ষু মুদিল।

ঘনশ্যাম আওড়াইয়া যাইতে লাগিল—"আপনার ভরসাতেই এ পাড়ায় রয়েছি, তা না হ'লে আমার মাথার উপর আছেই বা কে আর থাকলেই বা কে কার মুখ তাকায় বলুন!—আপনি যে দয়া ক'রে আমাদের মত লোককে ঘরে বসতে দেন, এই না আমাদের ভাগ্যি!—এমন শিবতুল্য লোক কি আর একালে জন্মায় মশাই—তাইত সেদিন গিন্নীকে বলছিলুম—'তারকেশ্বর যাবো, তারকেশ্বর যাবো করছ,—বাড়ীর গায়েই সাক্ষাৎ তারকেশ্বর রয়েছেন—যাও গিয়ে একদিন দেখে এসোগে—সাধে কি স্বভা আমার—'

এমন সময় বেহারী ক্যাশবাক্স লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং ইহার কয়েক মিনিট পরেই তিনখানি দশটাকার নোট ট্যাকে গুঁজিয়া,—নূতন একটা বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে ঘনশ্যাম গাঙ্গুলী নিবারণের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন বৈকালে সুভা আসিতেই নিবারণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—"কি, আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে পারি না, নয় ?" তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, ঘনশ্যাম বাড়ী গিয়া নিশ্চয় সুভার মার নিকট বলিবে—এমন মজলিসী লোক সে আর জীবনে দুটী দেখে নাই, এবং সুভা নিশ্চয়ই তাহা শুনিয়াছে। সুভা কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, সুতরাং সে এ কথার কোনও অর্থই খুঁজিয়া পাইল না। সে সংক্ষেপে বলিল—"তার মানে ?"

নিবারণ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—"তার মানে, তোর বাপকে আজ একেবারে কথার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিলুম তা জানিস্!—একটানা ১৫টি মিনিট একবারও না থেমে বকে গেছি;—কথা কই না তাই—নইলে একবার মুখ খুল্লে,—নিয়ে আয় না তোর কত ভদ্রলোক আছে—হুঁঃ।" একসঙ্গে এতগুলো কথা এত তাড়াতাড়ি বলিতে নিবারণকে সুভা এই প্রথম শুনিল, এবং এই সকল কথা বলিবার সময় তার মুখে-চোখে এমন একটা উত্তেজনা এবং উৎসাহ সে আজ লক্ষ্য করিল, যাহা নিবারণের পক্ষে অত্যন্ত বেশী অস্বাভাবিক এবং বেখাপ্পা বলিয়া তার চোখে ঠেকিতে লাগিল। নিবারণের মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে সে হাসিয়া ফেলিল।

নিবারণও ইতিমধ্যে বোধ হয় নিজের অস্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া গিয়াছিল—সে তার নিজস্ব স্বাভাবিক কোমল স্বরে বলিল, "হাসলি যে দিদি ?"

সুভা আবার হাসিল; কিন্তু কেন কে জানে তার চোখের কোণে কখন তার অজ্ঞাতসারে এক ফোঁটা অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর নিবারণ শয্যার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিল—সুভা পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অত্যন্ত করুণকণ্ঠে বলিল—"তোমাকে কারুর সঙ্গে কথা কইতে হবে না দাদামশাই—তুমি শুধু আমার সঙ্গে কথা কয়ো—তা হলেই হবে—বুঝলে।" সে স্বর অত্যন্ত গাঢ় এবং সহানুভূতিপূর্ণ। নিবারণ কোন কথা বলিল না,—সে কেবল সুভার কোমল ছোট্ট হাতখানি দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিল।

৬

ইহার পর গোটা চারিটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুভা এখন আর বালিকাটি নাই—সে এখন যোড়শী। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার বিবাহ হয় নাই। না হওয়ার একটা কারণও ছিল। ঘনশ্যাম গাঙ্গুলীর স্বগ্রামস্থ নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের জীবিত-কালে তাঁহারি পুত্র শ্রীমান বিমলের সহিত সুভার বিবাহের কথা খুব ছেলেবেলা হইতেই একরকম পাকাপাকি হইয়া গিয়াছিল। নীলরতনের অবস্থা মন্দ ছিল না, জমি-জারাত এবং ছোট-খাটো কিছু জমিদারী ছিল—তাহাতেই মোটা ভাত এবং মোটা কাপড় বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত; ছেলেটিও বেশ সুপাত্র। গ্রামের স্কুল হইতে সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানী পাইয়াছিল। তখন সুভার বয়স ৭ কি ৮ বৎসর। ঘনশ্যাম তখন দেশেই থাকিত—ঋণের দায়ে চাকরীর সন্ধানে তখন পর্য্যন্ত তাহাকে ভিটামাটি খোয়াইয়া কলিকাতায় পালাইয়া আসিতে হয় নাই। সামান্য যাহা জমি-জারাত ছিল তাহাতেই তাহার সংসার খুব স্বচ্ছলে না হইলেও নেহাত অস্বচ্ছলেও চলিত না। তাহার পর খুড়ার

সহিত সামান্য কয়েক বিঘা জমি লইয়া বাধিল মোকর্দ্দমা। পুরা ৩টি বছর ধরিয়া মামলা গড়াইল। ঘনশ্যামের যাহা কিছু জমিজমা ছিল, মোকর্দ্দমার খরচা জোগাইতে সে সমুদয় একে একে বাঁধা পড়িয়া গেল—তথাপি কিন্তু মামলায় সে জিতিতে পারিল না।

তাহার পর ভিটামাটি বেচিয়া, স্ত্রী এবং তিনটি কন্যাকে শ্যালকের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সে কলিকাতায় পলাইয়া আসে চাকরীর সন্ধানে। এ যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সুভার উপরের দুটি ভগিনীরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া জোগাড়ে ঘনশ্যাম খুঁজিয়া পাতিয়া অবশেষে জেটি সরকারের একটা কাজ জোটাইয়া লইল, এবং মাহিনা ও উপরিতে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই হাতে কিছু জমাইয়া ফেলিল। তাহার পরই সে স্ত্রী-কন্যাদের কলিকাতায় আনাইল, এবং নিবারণচন্দ্রের বাড়ীর গায়ের ভাঙ্গা বাড়ীটি নামমাত্র ভাড়ায় রফা করিয়া লইয়া কোনও রকমে দিন গুজরান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সুভার বিবাহের কথা সে অনেকবার নীলরতনের নিকট পাড়িয়াছিল, কিন্তু পুত্র বি, এ পাশ না করা পর্য্যন্ত তিনি ঘনশ্যামকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সুভার বয়সও তখন অল্প, সুতরাং ঘনশ্যামেরও বিশেষ তাড়া ছিল না। তার পর হঠাৎ একদিন ঘনশ্যাম শুনিল মাত্র তিন দিনের জ্বরে নীলরতন সহসা হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে এবং তাহার বড় ভাই তারিণী চট্টোপাধ্যায়

হইয়া দাঁড়াইয়াছেন বিমলের অভিভাবক। ঘনশ্যামের সহিত নীলরতনের কথাই ছিল, এ বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট পণস্বরূপ কিছুই লইবেন না—কেবল নেহাত 'নেমকর্ম্ম' হিসাবে যে সকল জিনিস না দিলেই নয়, তাহাই দিয়া 'নমোনমো' করিয়া কোনও রকমে ঘনশ্যাম কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবে। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হইয়াই বসিয়াছিল। আজ হঠাৎ নীলরতনের মৃত্যু-সংবাদে তার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং বিশেষ করিয়া তারিণীচরণের কথা ভাবিয়া সে একবারে বিশহাত মাটির তলায় বসিয়া গেল। এই তারিণীচরণকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না। হাঁড়ি ফাঁসিয়া যাইবার ভয়ে গ্রামের লোকে তাহার নাম প্রাণান্তে মুখে আনিত না, এবং শুনা যায়, প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহার শ্রীমুখ-পঙ্কজ দর্শন করিয়া ফেলিয়া অনেককেই নাকি অনেক প্রকার বিপদে পড়িতে হইয়াছে। এহেন তারিণীচাটুয্যে যেদিন শ্রীমান বিমলচন্দ্রের অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইলেন সে দিন ঘনশ্যাম চক্ষে সরিষাফুল দেখিতে আরম্ভ করিল। তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য তারিণীর সহিত সে অবসরমত একদিন দেখা করিল এবং বিমলের সহিত সুভার বিবাহের কথা পাড়িয়া বসিল। নীলরতনের সহিত দেনা-পাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ঘনশ্যাম তারিণীকে সে সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিল।

হাসিয়া আপ্যায়িত করিয়া তারিণী বলিল—"আহা, এত

ঘরের কথা হে ঘনশ্যাম—আপোষে দেনাপাওনার কথাটা চুকিয়ে ফেল্লেই ত হয়।"

ঘনশ্যাম হাতযোড় করিয়া বলিল—"নীলরতনদার সঙ্গে আমার কথাই তো ছিল তারিণী-দা, শাঁখা হাতে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করবো—আজ তবে আবার—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারিণী বলিল, "তা, আমিই কোন্ লাখ্ পঞ্চাশ চাইছি তোমার কাছ থেকে হে!"

কতক আশ্বস্ত হইয়া ঘনশ্যাম বলিল—"তা বেশ বলুন কি দিতে হবে আমাকে।"

চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া তারিণী বলিল, 'চার হাজার টাকা নগদ, বাস্, আর কিছু নয়।"

ঘনশ্যামের চক্ষু কপালে ঠেলিয়া উঠিল—"চার হাজার টাকা কোথায় পাবো তারিণী-দা?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারিণী বলিল, "না পাও মেয়ের বিয়ে অন্য যায়গায় দাওগে যাও না ভায়া—কেউ ত মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রাখে নি।" সুতরাং ঘনশ্যামকে সেখান হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

এ যখনকার কথা বলিতেছি তখন সবে মাত্র সুভারা কলিকাতার বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে, এবং সুভার বয়স তখন এগার কি বার হইবে। দেশে সুভাদের বাড়ী এবং বিমলদের বাড়ী একেবারে পাশাপাশি। এই দুই ব্রাহ্মণপরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল খুব বেশী। ছেলেবেলায় বিমলের আড্ডাই ছিল সুভাদের

বাড়ীতে। ইস্কুল হইতে ফিরিয়া, কাপড় জামা না ছাড়িয়াই অর্দ্ধেকদিন বিমল স্বভাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইত এবং সেই খানেই জল-যোগের পালা সারিয়া ঘুড়ি এবং লাটাই লইয়া তাহাদের ছাতে গিয়া উঠিত।

তার পর বিমল প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিল। ওদিকে ঘনশ্যামও মোকর্দ্দমায় হারিয়া ভিটামাটি খোয়াইয়া চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় চলিয়া আসিল,—আর স্বভা তার মার সহিত তার মামার বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইল। সুতরাং এই কয়টা বৎসর বিমলের সহিত স্বভার একবারও দেখা হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

তার পর হঠাৎ একদিন বিমল শুনিল, স্বভারা কলিকাতায় আসিয়া বাসা ভাড়া লইয়াছে। তার জ্যেঠা তারিণীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিত। সেই সূত্রে তারিণীচরণের সংসারটি আজ বৎসর খানেক হইল কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে, এবং বিমল ও তার বিধবা মা ইহাদেরই পরিবার-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিমল এই সময় বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিল।

৭

সেদিন সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরের দরজার কাছ হইতে ভিতরের দিকে একবার মাত্র উঁকি মারিয়াই ঘনশ্যাম হাঁকিল—"কাকে ধরে এনেছি, দেখেছ!" সুভার-মা ঝোল সাঁতলাইতেছিল,—শব্দায়মান কড়াটাকে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চৌকাঠের গোড়ায় জুতা ছাড়িয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিমল তাহার পদ-ধূলি লইয়া নমস্কার করিল।

"অমনি-ই আশীর্ব্বাদ করছি বাবা—আর প্রণাম করতে হবে না।" বলিয়াই সুভার মা একটা কাঠের পিঁড়ি আগাইয়া দিল এবং বিমল তাহার উপর বসিলে তাহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুই যে বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্, বিমল, —আমি প্রথমটা তোকে চিন্তেই পারি নাই।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "তুমি আর মা চিরকালটাইত আমাকে রোগা হ'তে দেখে আসছ, পিসীমা।"

"নারে, সত্যি সত্যি তুই বড্ড রোগা হ'য়ে গেছিস্"—বলিয়াই

৮

ইহার কয়েক দিন পর রবিবারের এক সকালে নিবারণের নিকট গিয়া বিমলের সহিত স্নভার বিবাহের কথা পাড়িয়া ঘনশ্যাম একেবারে কান্নাকাটি করিয়া ধন্না দিয়া পড়িল—"এ যাত্রা আমাকে উদ্ধার করিতেই হবে, নিবারণবাবু।"

অত হাতে পায়ে ধরাধরির কোনই প্রয়োজন ছিল না, কেন না স্নভার বিবাহের জন্য চারি হাজার টাকা খরচ করিতে নিবারণ কোন দিনই নারাজ হইত না। তথাপি ঘনশ্যাম বুক চাপড়াইল, কাঁদিল, হাহুতাশ করিল, পায়ে ধরিল, এবং আরও অনেক কিছু করিয়া বসিল, এবং সে যে কতকষ্টে এই অতিবড় কৃপণ এবং অর্থপিশাচ লোকটিকে অভিনয় দেখাইয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া কবুল করাইয়া আসিয়াছে, বাড়ী গিয়া তাহা ফেনাইয়া বাড়াইয়া এতখানি করিয়া গৃহিণীর কাছে বলিয়া নিজের বাহাদুরীতে খুব খানিকটা গর্ব্ব অনুভব করিল।

আড়াল হইতে স্নভা সমস্তই শুনিয়াছিল—তার কান্না পাইতে লাগিল। তার এই এত বড় ভালমানুষ শিবতুল্য দাদামশাইটির

উপর এই যে অমানুষিক অত্যাচার,—এই যে তাহাকে ঠকাইয়া বোকা বানাইয়া আসিবার হৃদয়হীন মিথ্যা বাহাদুরী, ইহার প্রত্যেকটি কণ্টক তার বুকের মধ্যে বিঁধিতেছিল। সুভা জানিত তাহার বিবাহের নাম করিয়া নিবারণের নিকট হইতে টাকা আদায় করা কত সোজা, এবং জানিত বলিয়াই ঘনশ্যামের এই সব অলীক এবং মিথ্যা বাহাদুরী তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, এবং ইহাতে ঘনশ্যামের উপর তার যে পরিমাণে অশ্রদ্ধা এবং অভক্তি আসিতেছিল; নিবারণের প্রতি ঠিক সেই পরিমাণেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তার বুকখানি ভরিয়া উঠিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, এক্ষণি গিয়া নিবারণের পা দুটো জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া আসে,—"এসংসার তোমার জন্যে নয়, দাদামশাই,—তুমি এ সংসারের অনেক উর্দ্ধে।"

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় নিবারণ আপনার শয়নকক্ষে শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছিল, এমন সময় সুভা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল-—"দাদামশাই!" বইটাকে মুড়িয়া রাখিতে রাখিতে নিবারণ বলিল, আয় দিদি আয়—আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলি দিদি?"

নিবারণের পাশে শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া সুভা বলিল, "কাল রাত থেকে মার জ্বর হয়েছে কিনা, তাই রান্নাবান্নার হাঙ্গাম সারতে দেরী হয়ে গেল, দাদামশাই!"

তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নিবারণ বলিল

"তাই ভালো, আমি ভাবলুম বুঝি দিদি আমার এখন থেকেই মায়া কাটাতে স্বরু করে দিলে।"

স্বভা চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল—কেন কে জানে তার কান্না পাইতে লাগিল।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শয্যায় শুইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত স্বভার নিদ্রা আসিল না। বিমলের সহিত তার বিবাহ হইবে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সে সত্যসত্যই বিমলকে ভালবাসিত, এবং যে দিন তারিণীচরণের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম বিমলের আশা ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, সে দিন স্বভা সত্যসত্যই দুনিয়াটা অন্ধকার দেখিয়াছিল। তার পর কতসময় সে কল্পনা করিয়াছে বেশ হয়, যদি হঠাৎ বিমলের জ্যাঠা তারিণীচরণ একদিন রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে,—জটাজূটধারী কোন্ এক মহাপুরুষ তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিতেছে—সে যদি বিমলের সহিত স্বভার বিবাহ না দেয় তাহা হইলে তার সর্ব্বনাশ হইবে। এমনি আরও কত কি কথা,—তার পর তারিণীচরণ আসিয়া ঘনশ্যামের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে এবং অবশেষে বিমলের সহিত তার বিবাহ দিতে বাধ্য হইবে।

এমনি আরো কত কি আবোল-তাবোল কল্পনা, যার মাথা নাই অথচ যা মানুষকে হাসায় কাঁদায়। আজ কিন্তু স্বভার কল্পনা সত্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে—দুদিন পর সত্য-

সত্যাই বিমলের সহিত তার বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই অতিবড় আনন্দের এবং সুখের অবস্থাটিকে পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে গিয়া তার মন আজ বার বার ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। তার মন বার বার ভিতরে ভিতরে এই বলিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল যে, তার বাপের মত সেও তার এই উদার, স্নেহময় দাদামশাইটির উপর অত্যাচার করিতেছে না ত? তার কান্না আসিতে লাগিল। কেন এই বৃদ্ধটির সহিত তার আলাপ হইল? কেন এই আত্মীয়-স্বজন-হীন অসহায় বৃদ্ধটা তার সমস্ত অসহায়তা এমন করিয়া তার চোখের সুমুখে মেলিয়া ধরিল?—সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে এই অসহায় অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধটির অবস্থা যে কি হইবে, তাহা ভাবিতে গিয়া আজ সুভা বার বার মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।—তার মনে হইতে লাগিল সে যেন জানিয়া শুনিয়া এই বৃদ্ধটির উপর অত্যাচার করিতে বসিয়াছে, এবং এই অত্যাচারটা যাহাতে ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্য তাহারি নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া, ঠকাইয়া টাকা আদায় করা হইতেছে। ছট্ ফট্ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া সুভা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছিল—বাহিরের উদার মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সেই রাত্রেই শয্যায় শুইয়া নিবারণের মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিমল নামক একটি যুবকের কাল্পনিক চেহারা বার বার ভাসিয়া উঠিতেছিল। এই যুবকটিকে সে কখন চক্ষে দেখে নাই

—কেবল নাম শুনিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহার মোলায়েম নামটি মনের মধ্যে বার বার আওড়াইয়া তার দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল—সে অত্যন্ত সুন্দর এবং কমনীয়! একথা যতই সে ভাবিতে লাগিল ততই তার মনটা কেন কে জানে ভিতরে ভিতরে দারুণ ক্ষুন্নতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ প্রথম নিবারণের মনে হইল—সেও একদিন যুবক ছিল এবং হয়ত বা সুন্দরও ছিল। তার এই একঘেয়ে নীরস জীবনটার মাঝখানে কবে যে যৌবন আসিয়াছিল এবং কবে যে অনাদর এবং অবজ্ঞা মাত্র পাইয়া অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার কথা কোনদিন মনেই আসে নাই। তাহারি সামান্য ইতিহাস খানির পুরাতন ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি যে কোনদিন উল্টাইয়া দেখিবার জন্য তার তাগিদ আসিবে তাহা সে কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই—আজ কিন্তু সত্যসত্যই তাগিদ আসিল।

কেন কে জানে নিবারণের আজ মনে হইতে লাগিল তার সমস্ত জীবন ধরিয়া সে কেবল ভুলই করিয়া আসিয়াছে। যে দায়িত্ব এবং ঝঞ্ঝাটের দিকে সভয়ে চাহিয়া জীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদকে সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আজ তার মনে হইতে লাগিল সেগুলো হয়ত ঠিক ততটা ভয়ঙ্কর নয়।

সে মনে মনে কল্পনা করিল,—সুভার ভারি কোন পীড়া হইয়াছে, এবং সারারাত ধরিয়া মাথার শিয়রে বসিয়া সে সেবা করিতেছে ;—ইহার মধ্যে ঝঞ্ঝাট সে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, বরং যাহা পাইল তাহা তার মনের মধ্যে বেশ একটি অপূর্ব্ব আত্ম-

প্রসাদ এবং তৃপ্তি আনিয়া দিল। আজ প্রথম যেন তার হুঁস হইল সুভা যুবতী এবং সুন্দরী, এবং দুনিয়ার আর পাঁচজন যুবতীর মতই কাহারও স্ত্রী হইবার সম্ভাবনা তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। এতদিন ধরিয়া দিনরাত কাছাকাছি থাকিয়াও যাহার যৌবন এবং সৌন্দর্য্য তার চোখে কোনদিন ধরা পড়ে নাই, আজ একটি কাল্পনিক সুন্দর যুবকের পাশে তাহাকে কল্পনায় দাঁড় করাইয়া দিয়া তাহারি যৌবন এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সে সহসা পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল, এবং সেই সঙ্গে বার বার করিয়া তার মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল—সে বৃদ্ধ এবং কুৎসিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বটতলার কি একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস সে পড়িয়াছিল—কি করিয়া এক অসহায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের যুবতী সুন্দরী স্ত্রীকে একটি ধনী লম্পট যুবক শুধু কেবল সৌন্দর্য্যের মোহে ভুলাইয়া ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং তাহার পর পাছে কোনরূপ গোলমাল উঠে, সেই ভয়ে, সেই বৃদ্ধটিকে কি নৃশংসভাবেই না হত্যা করা হইয়াছিল। আজ কেমন করিয়া কে জানে তার হঠাৎ মনে হইয়া গেল—সুভা যেন তার বিবাহিতা স্ত্রী এবং বিমল নামক এই যুবকটি তাহার হাত হইতে তাহাকে ভুলাইয়া, ফুসলাইয়া, ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তাহার পরই সুভার সম্বন্ধে এমন সব কল্পনা এবং চিন্তা তার মনের মধ্যে উঠিতে লাগিল, যাহার কথা ভাবিয়া সে নিজেই হঠাৎ কেমন যেন লজ্জিত হইয়া উঠিল,—তার মনে হইতে লাগিল, সে যেন গোপনে গোপনে এই সরল

এবং স্নেহপ্রবণ বালিকাটির বিরুদ্ধে জঘন্য একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। তার মনে হইতে লাগিল পরদিন প্রাতঃকালে সুভা আসিয়া যখন তার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তখন কি করিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইবে? তার দৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকিবে যাহাতে করিয়া তাকে ধরিয়া ফেলা সুভার একটুও শক্ত হইবে না।

৯

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া জানালার দিকে চোখ পড়িয়া যাওয়া মাত্র নিবারণ দেখিল—সুভাদের সেই ছোট ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া তাহাদের ভাঁড়ার ঘরের যে অংশটা দেখা যাইতেছে,—তাহারই একধারে একটা বঁটি লইয়া বসিয়া সুভা ঘাড় হেঁট করিয়া তরকারী কুটিতে ব্যস্ত। এক মুহূর্ত্তে তাহার যৌবন এবং সৌন্দর্য্য নিবারণের চক্ষের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত ঝলকিয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল,—এই একটি রাত্রের ব্যবধান সুভার কৈশোর এবং যৌবনটির মাঝখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে কখন অসীম হইয়া উঠিয়াছে।

বায়স্কোপে নায়িকার কৈশোরের দু-চারিটা মাত্র দৃশ্য দর্শকের চোখের সুমুখে ধরিয়া—তারপর হঠাৎ যেমন দশ বৎসরের পরের ঘটনা হইতে পালা সুরু করিয়া দেওয়া হয়, অথচ এই দশটা বৎসর প্রকৃতপক্ষে দর্শকের চক্ষের সম্মুখে নিমেষেই কাটিয়া যায়, ঠিক তেমনি করিয়া নিবারণের চক্ষের সম্মুখে সুভার কৈশোর যেন এক রাত্রেই শেষ হইয়া গেল, এবং যেখান হইতে সে আজ নূতন করিয়া পালা সুরু করিয়া দিল, সেখানে সে যুবতী এবং সুন্দরী।

দ্বিপ্রহরে স্নভা আসিয়া যখন তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, নিবারণ তখন সবে আহার সারিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। স্নভার পদশব্দে সে ইচ্ছা করিয়াই চক্ষু মুদিল। স্নভা আসিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ডাকিল—"ঘুমুচ্ছো নাকি দাদামশাই ?" সে সেইভাবে চক্ষু মুদিয়াই উত্তর দিল, "না ঠিক ঘুমোই নি—মাথাটা বড্ড ধরেছে, তাই চোখ বুজে পড়ে আছি।"

"মাথা টিপে দোবো দাদামশাই ?" বলিয়া স্নভা শয্যাপ্রান্তে বসিল।

"না কিচ্ছু করতে হবে না, একটু চুপ করে ঘুমোতে পারলেই সব সেরে যাবে'খন—",—বলিয়া নিবারণ যেমন চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, তেমনই শুইয়া রহিল।—কেন কে জানে স্নভার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে আজ তার সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না। স্নভা কিন্তু কোন কথা শুনিল না—সে জোর করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পর নিবারণ নিদ্রা গিয়াছে ভাবিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর নিবারণের মাথার যন্ত্রণা কমিয়াছে কিনা খোঁজ লইতে আসিয়া স্নভা দেখিল, নিবারণ বাড়ীতে নাই। বিহারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল,—বায়স্কোপে গিয়াছেন। স্নভার মনে কেমন যেন খট্‌কা লাগিল, যে নিবারণ তাহাকে সঙ্গে না লইয়া বায়স্কোপ দেখিতে একদিনও যায় নাই, এমন কি

কোনদিন কোনও কারণে স্বভার না যাওয়া হইলে, যে-নিবারণ সেদিনকার মত বায়স্কোপ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিত, আজ সেই নিবারণ তাহাকে না জানাইয়া এই যে গোপনে বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল, স্বভার নিকট ইহা কেমন যেন স্বাভাবিক এবং সহজ বলিয়া মনে হইল না। তার দ্বিপ্রহরের ব্যবহারের মধ্যেও সে যেন একটা আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। মাথা ত তার ইতিপূর্ব্বে কতদিনই ধরিয়াছে; কিন্তু এমন নিরপেক্ষ ঔদাসীন্য সে ত নিবারণের মধ্যে কোনদিন লক্ষ্য করে নাই। তারপর সন্ধ্যার সময় আসিয়া সে যখন শুনিল, নিবারণ তাহাকে না জানাইয়া বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছে, তখন সে স্পষ্ট ধরিয়া ফেলিল, ইহার মধ্যে কোথাও একটা কিছু নিশ্চয়ই তাহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে গজাইয়া উঠিতেছে; কিন্তু অনেক ভাবিয়াও এই 'একটা-কিছুর' সন্ধান সে কোনমতেই করিয়া উঠিতে পারিল না।

পরদিন সকালবেলা আসিয়া নিবারণকে সুমুখে পাইয়া স্বভা বলিল—"তুমি কাল সন্ধ্যার পর কোথায় গেছ্লে দাদামশাই?" মাথা চুলকাইয়া, দুবার ঢোক গিলিয়া লইয়া নিবারণ বলিল, "একটু কাজে বেরিয়েছিলুম।"

তার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্বভা বলিল—"তবে বেহারী বল্লে বায়স্কোপ দেখতে গেছ!"

নিবারণ এবার সত্যসত্যই বিপন্ন হইয়া পড়িল। তার মনে হইতে লাগিল, একটা মিথ্যা চাপা দিতে গিয়া সে আজ তার

অন্তরের অনেক কিছু গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছে, এবং সুভার কাছে হয়ত বা সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

"কথা কইছো না যে ?" বলিয়া সুভা তার মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি নিবারণের পক্ষে সত্যসত্যই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। পুলিশের জেরার সময় অপরাধীর মনের অবস্থা যেরূপ হয়, নিবারণের মানসিক অবস্থা আজ ঠিক তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুভা বলিল—"বুঝেছি দাদামশাই, তুমি আজকাল আমাকে আর আগেকার মতন—" এই অবধি বলিয়াই সুভা হঠাৎ থামিয়া গেল—"ওকি তুমি কাঁদছো নাকি দাদামশাই ?"—সুভা গিয়া হাত ধরিতেই বৃদ্ধ নিবারণ হঠাৎ অসহায় বালকের মত ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিবারণ লজ্জায় একবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল, সে আজ সুভার নিকট সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়িয়া গিয়াছে ; কিন্তু কেন কে জানে সঙ্গে সঙ্গে সে খানিকটা হাঁফ্ ছাড়িয়াও বাঁচিল। তার মনে হইতে লাগিল, যে কথাটা সুভাকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিবার মত দুঃসাহস তাহার কোন দিনই হইত না, তাহার এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত আজ তাহাই প্রকারান্তরে তাহাকে আভাসে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছে। একটা বিপদকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ভয় করিতে করিতে হঠাৎ একদিন সেই বিপদটা আসিয়া পড়িয়া চুকিয়া গেলে পর মানুষ যেমন একটা

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে এবং হঠাৎ মরিয়া হইয়া উঠিয়া অতিরিক্ত রকম সাহস প্রকাশ করিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া নিবারণ আজ হঠাৎ ভিতরে ভিতরে মরিয়া হইয়া উঠিল। তার ধারণা হইয়াছিল সুভা নিশ্চয়ই তার অন্তরের কথা জানিয়া ফেলিয়াছে। তাই সুভা যখন তাহাকে বলিল—"তুমি বুঝি এখন থেকে আমার মায়া কাটাবার চেষ্টা করছো দাদামশাই?" সে তখন টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দোষ কি শুধু আমারই সুভা? শুধু কেবল বুড়ো ব'লে তুইও কি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস্ না, দিদি?"

সুভা এ কথার অর্থ ঠিক পুরাপুরি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহিল না। তার মনে হইল, এটা নিছক্ রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু রসিকতা করিতে গিয়া কোন দিন মানুষের স্বর যে কাঁপিয়া উঠে, ইহা সুভা আজ এই প্রথম দেখিল। কিসের একটা সুদূর সম্ভাবনা তার মনের মধ্যে সহসা ভাসিয়া উঠিতে যাইতেই সে প্রাণপণ শক্তিতে তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নীচের দিকে জোর করিয়া ঠেলিয়া নামাইয়া দিল, এবং কথাটাকে সহসা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—"কাল কিসের পালা ছিল, দাদামশাই?"

১৩

পরদিন সকালে নিবারণ বাহিরের ঘরে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল এমন সময় ঘনশ্যাম আসিয়া দু-চারটে বাজে কথার পরই হঠাৎ সুভার বিবাহের কথা পাড়িয়া বসিল—"তাহ'লে তারিণী চাটুয্যের সঙ্গে পাকাপাকি করে ফেলি—কি বলেন ?"

"সে আপনারা বুঝুন—আমি কি বলবো বলুন !" বলিয়া নিবারণ তাকিয়াটা কোলের উপর টানিয়া লইল।

"আমরা বুঝ্‌বো কি রকম ?—আপনিই ত হচ্ছেন সব, সুভা ত আপনারই জিনিষ নিবারণবাবু।"—ঘনশ্যাম সাগ্রহে তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

কি একটা কথা হঠাৎ নিবারণের গলা পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। ঘনশ্যাম আবার বকিয়া যাইতে লাগিল—"তারিণী চাটুয্যের মত লোক যে সুভার সঙ্গে বিমলের বিবাহ দিতে রাজী হয়েছেন সে ত আর সুভার বাপের দিকে চেয়ে নয় নিবারণবাবু!—সে কেবল তার দাদামশায়ের মুখ তাকিয়ে।"

এই সকল ছেঁদো কথা নিবারণের আদপেই ভাল লাগিতেছিল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘনশ্যাম আবার বকিয়া যাইতে লাগিল, "গৃহিণী তাই সেদিন বলছিলেন—তুমি আমি ওর মিথ্যে বাপ মা,—সত্যি বাপ মায়ের কাজ করলে ওর দাদামশাই।"—নিবারণ তথাপি কোন উত্তর দিল না। বেগতিক বুঝিয়া ঘনশ্যাম এবার সোজাসুজি কাজের কথা পাড়িল—"তাহ'লে চার হাজারেই রাজি হ'য়ে যান কি বলেন? ঐ চার হাজার আর তার ওপর খাওয়াদাওয়া এদিক-ওদিক ক'রে আরও একটা হাজার ধরে রাখুন।"

হঠাৎ কি মনে করিয়া নিবারণ বলিল—"ও চার হাজারের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল—"সে কি আর জানি না মশায়,—ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন,—সুভার আমার ভাবনা কি; তাইতো সুভাকে বলি,—আর জন্মে অনেক তপস্যা করেছিলি তাই এমন—"

বিরক্ত হইয়া নিবারণ বলিয়া উঠিল—"আমাকে কি কথা বলতে দেবেন না?"

জিব কাটিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ঘনশ্যাম বলিল,—"সুভার বিবাহ,—কথা যা কিছু সে ত আপনিই কইবেন দাদা—আমরা ত কেবল নির্ব্বাক শ্রোতা মাত্র।" সে কথায় কান না দিয়া নিবারণ বলিল—"বলছিলুম সুভার বিবাহ না হয় কোন রকমে হ'য়ে গেল, কিন্তু দেশের সমস্ত

জমিজারাৎ মায় পৈতৃক ভদ্রাসনটুকু পর্য্যন্ত যে বাঁধা পড়ে রইলো তার খালাসের করছেন কি ?”

এই অসংলগ্ন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য ঘনশ্যাম হঠাৎ নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং ইহার যে কি জবাব দেওয়া যাইতে পারে তাহাও সে ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া নিবারণের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

নিবারণ আবার বলিল—“মেয়ের বিবাহ না হয় হ’য়ে গেল, কিন্তু ঐ কচি ছেলেটার ভবিষ্যৎও ত ভাবতে হবে।”

হঠাৎ কোথায় কি যেন একটা খেই পাইয়া গিয়া ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল—“হবে বই কি—একশবার ভাবতে হবে ;—কিন্তু হারে পোড়া কপাল—”এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ঘনশ্যাম হঠাৎ কোঁচার খুঁটটা শুষ্ক চোখ দুটার উপর বুলাইয়া লইল, এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গলা কাঁপাইয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, “যদি দু-বেলা দুমুঠো অন্ন যোগাবার ক্ষমতা দাও নি, তবে বাছাদের এই হতভাগার ঘরে পাঠালে কেন, ঠাকুর !”

সে কথায় কান না দিয়া নিবারণ বলিল—“এক কাজ করুন না কেন !”

ঘনশ্যাম লাফাইয়া উঠিল—“কি করব বলুন দাদা !”

কি একটা কথা বলিতে গিয়াও নিবারণ বলিতে পারিল না। সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—"কি করতে হবে বলুন, নিবারণবাবু!"

কিসের যেন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া ঘনশ্যাম ভিতরে ভিতরে এক নিমেষে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ নিবারণ বলিয়া উঠিল—"দেখুন ঘনশ্যাম বাবু, আপনার সমস্ত জমি-জারাত, মায় ভদ্রাসন নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে খালাস ক'রে দিতে পারি—যদি—"এইখানে হঠাৎ একবারে ঢোক গিলিয়া লইয়া নিবারণ আবার বলিল—"যদি স্বভার সঙ্গে আমার—," তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ঘনশ্যাম লাফাইয়া উঠিল—"সে ত আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি নিবারণবাবু—," সে আরো কত কি বলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ চাহিয়া দেখে, নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চটিযোড়ার মধ্যে পা ঢুকাইয়া দিতেছে।

বাড়ী গিয়া ঘনশ্যাম স্ত্রীর নিকট খুব খানিকটা লাফালাফি করিল,—এবং সে যে কত কৌশলে এবং কি পরিমাণ বুদ্ধি খরচ করিয়া এই পরম উদাসীন চিরকুমার জমিদারটিকে শুধু কেবল কথার মারপ্যাঁচে ভুলাইয়া এ বিবাহে সম্মত করিয়াছে, এবং কিরূপ চালাকি করিয়া ঠকাইয়া সে এই অতিবড় কৃপণ বৃদ্ধটিকে তার সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি নিজের গাঁটের কড়ি দিয়া উদ্ধার করিয়া দিবার ভার লইতে বাধ্য করাইয়াছে, তাহাই বাড়াইয়া এতখানি করিয়া বলিয়া মনে মনে খুব খানিকটা গর্ব্ব

অনুভব করিল। সুভার মা কিন্তু এই পরম শুভ সংবাদটিতে তেমন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না,—যদিও সংসারে এবং ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে চাহিয়া জোর করিয়া ইহার বিরুদ্ধে বাধা দিতেও সাহস করিল না।

কথাটা সুভার কানে পৌছিতে দেরী হইল না।—লজ্জায় ঘৃণায় তার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই যে এত দিন ধরিয়া সে সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই যখন তখন নিবারণের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া আসিতেছে, ইহাতে তার নারীত্ব প্রতিপলে, প্রতিদণ্ডে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। নিবারণের সেদিনকার যে রসিকতাটার অর্দ্ধেকটামাত্র বুঝিয়া সে মনে হাঁকপাক করিয়া মরিতেছিল, আজ তাহারি সম্পূর্ণ রূপটি দেখিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ঘৃণায় এবং বিতৃষ্ণায় তার বুকের ভিতরটা একেবারে পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, সে যেন নিলামের মাল, এবং নিবারণ যেন সর্ব্বোচ্চ দর হাঁকিয়া তাহাকে কিনিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

এই বৃদ্ধটিকে সে একদিন দেবতা জ্ঞানে কতই না শ্রদ্ধা করিয়াছে!—আজ নিজের উপর পর্য্যন্ত তার ধিক্কার আসিতে লাগিল,—তার মনে হইতে লাগিল স্তূপীকৃত কুপ্রবৃত্তি এবং লালসা ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়া বার্দ্ধক্যের মুখোস পরিয়া এই প্রতারক ভণ্ড লোকটা এতদিন ধরিয়া গোপনে গোপনে তিল তিল করিয়া তার নারীত্বকে অপমানিত করিয়া আসিয়াছে।

পরদিন নিবারণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘনশ্যাম বিবাহের সমস্ত পাকাপাকি করিয়া ফেলিল। ঠিক হইল, বিবাহের পরই নিবারণ নিজের খরচায় ঘনশ্যামের সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে, এবং উপস্থিত বিবাহের খরচার জন্য সে ঘনশ্যামকে হাজার টাকার একটা চেক্ লিখিয়া দিল। ইতি-পূর্ব্বে তারিণী চাটুয্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘনশ্যাম দেনা-পাওনার কথা একপ্রকাব চুকাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং উভয় পক্ষ হইতেই দিন দেখাদেখি চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন তারিণীচরণ ঘনশ্যামের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পোষ্টকার্ড পাইল যে বিশেষ কোনও কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বভার অন্যত্র বিবাহ স্থির করিতে হইয়াছে এবং সে জন্য সে আন্তরিক দুঃখিত—ইত্যাদি।

সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তারিণী মনে মনে সত্যসত্যই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।—নগদ চার হাজার টাকা হয়ত সে অন্যত্রও পাইতে পারে, কিন্তু নিবারণের মত একটি শাঁসালো লোক অথচ নিঃসন্তান ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতার সৌভাগ্য মানুষের জীবনে একবার বেশী দু-বার আসে না।

১১

আজ নিবারণের বিবাহ! সুভারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা ছাড়িয়া সেই পাড়ারই আর একটা বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম আয়োজনের কোনও ত্রুটী করে নাই;—কারণ সে জানিত—কড়ি যতই লাগুক না কেন, পশ্চাতে গৌরীসেন রহিয়াছে। সন্ধ্যা ৭টার লগ্নে বিবাহ। তারপর ৯টা, ১০টা এবং ১২টায়ও লগ্ন ছিল, কিন্তু নিবারণের ইচ্ছামত সন্ধ্যার লগ্নেই বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল।

ঘনশ্যাম সম্প্রতি কন্যার বিবাহোপলক্ষে যে বাড়ীটিতে উঠিয়া গিয়াছিল, নিবারণের বাড়ীর ছাদ হইতে সে বাড়ীটি দেখা যাইত। আজ সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াই নিবারণ শুনিল, বিবাহবাড়ীতে সানাই ভৈরবী ধরিয়াছে। কেন কে জানে সানায়ের এই প্রভাতী সুরটা তার নিকট আজ বড্ড বেশী করুণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল—এ যেন শুধু কেবল কান্না আর কান্না। তার মনে হইতে লাগিল, এ যেন সুভার কান্না বাতাসে বাতাসে করুণ হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। একটা

দারুণ অবসাদে তার সমস্ত চিত্তটা যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটা ভাড়াটে ট্যাক্সি করিয়া পুরোহিত ও নাপিত মাত্র সঙ্গে লইয়া বর আসিয়া ঘনশ্যামের দরজায় দাঁড়াইল। ঘনশ্যামের উৎসাহের অন্ত ছিল না—সে নিজে আসিয়া হাত ধরিয়া বর নামাইল।

নিবারণের মুখে কিন্তু উৎসাহের লেশমাত্র ছিল না; তার কেমন যেন ভয়-ভয় করিতেছিল। চারিদিকের কোলাহল এবং লোকের ঠেলাঠেলিতে তার যেন দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল—সকলে মিলিয়া তাকে যেন পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছে। সে কল্পনায় দেখিতে লাগিল, এই সকল গণ্ডগোল এবং কোলাহল আজ হইতে তার সঙ্গ লইতেছে, এবং জীবনের শেষ দিন অবধি তাহাকে ঠিক এমনি করিয়াই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

সে যে স্বেচ্ছায় এ বিবাহে রাজী হইয়াছে—একথা বিশ্বাস করিতে তরে মন আজ কিছুতেই রাজী হইতেছিল না;—তার মনে হইতেছিল, কেহ যেন জোর করিয়া ভয় দেখাইয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাহাকে এই দারুণ গণ্ডগোল এবং ঝঞ্ঝাটের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এবং উঠিবার চেষ্টা করিলেই লাঠি মারিয়া তার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে।

সভায় গিয়া বসিয়া সে একবার নিজের অবস্থাটা ভাবিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আর কয়েক মিনিট পরেই সুভার সহিত

তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে; এখনি হয়ত ছাদনাতলায় তার ডাক পড়িবে, তারপর ছাইভস্ম কত কি হইবে, শাঁখ বাজিবে, হুলুধ্বনি উঠিবে, হট্টগোলে কাণ পাতিবার জো থাকিবে না,—তারপর শুভদৃষ্টির পালা। বিশ্বদুনিয়াটাকে আড়াল করিয়া দিয়া একটীমাত্র বস্ত্রখণ্ডের অন্তরালে সুভার সহিত তাহাকে দৃষ্টি বিনিময় করিতে হইবে,—নিরারণের বুকের ভিতরটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল—তার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। কি করিয়া সে তাকাইবে?—অসম্ভব!—অসম্ভব!

সে কল্পনায় দেখিতে লাগিল—দেহ নাই, শুধু দুটী অগ্নিচক্ষু তার মুখের দিকে একদৃষ্টে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে—নিবারণ ভয়ে চক্ষু মুদিল।—তার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট একটী লোককে ডাকিয়া সে বলিল, "ঘনশ্যামবাবুকে একবার ডেকে দিতে পারেন?"—তার গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

লোকটি তার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকাইয়াই শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?"

"না ও কিছু না—আপনি দয়া করে ঘনশ্যামবাবুকে একবার ডেকে দিন।"—বলিয়া মখমলের তাকিয়াটার উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া সে চোখ বুজিল।

পরমুহূর্ত্তেই হন্তদন্ত হইয়া কোমরে একটা গামছা জড়াইয়া ঘনশ্যাম ছুটিয়া আসিল এবং কোন কথা না শুনিয়াই চেঁচামেঁচি করিতে সুরু করিয়া দিল—"সমস্ত দিন খাওয়া নেই—আমাদের

মতন মুটেমজুর লোক ত আর নন্,—ঝাড়ু মার শাস্তরের মুখে,—যত ব্যাটা গাঁজাখোর মিলে দেশটাকে একবারে—তার ওপর আজকালকার চাকরবাকরও হয়েছে তেমনি—এক এক ব্যাটা যেন এক এক তেজচন্দরের নাতি—ব্যাটারা জোরে জোরে বাতাস কর্‌তে পারিস্ না!—হারামজাদা শুয়োর ব্যাটা কোথাকার!"

বক্তৃতা শেষ করিয়া নিবারণের পাশে গিয়া বসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অত্যন্ত করুণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—"বল কি কষ্ট হচ্ছে বাবাজী?" সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নিবারণ বলিল—"আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে—একটু আড়ালে যেতে চাই।"

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম বলিল—কোন গোপনীয় কথা নাকি?"

"হাঁ।"

আড়ালে গিয়া নিবারণ বলিল—"ঘনশ্যামবাবু আমাকে ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করতে পারবো না।"

ঘনশ্যাম কি বলিতে যাইতেছিল,—তাহাকে থামাইয়া দিয়া নিবারণ বলিল—আপনার পায়ে পড়ি ঘনশ্যামবাবু এযাত্রা আমাকে বাঁচান! এখনও অনেক লগ্ন আছে, আপনি গিয়ে তারিণীবাবুর হাতে পায়ে ধরে রাজী ক'রে বিমলকে নিয়ে এসে কন্যাসম্প্রদান করুন—তাতে যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজী আছি—দোহাই ঘনশ্যামবাবু, আমাকে বাঁচান আপনি!"

ঘনশ্যাম মুখে খুব খানিকটা দুঃখ প্রকাশ করিল, মনে মনে কিন্তু খুব খুসী হইয়া গেল। সে জানিত টাকা ফেলিতে পারিলে তারিণীকে রাজী করা একটুও শক্ত হইবে না। মাঝে হইতে টাকাটাও পাওয়া যাইবে, অথচ জামাইও মনের মত হইবে। মুখে কিন্তু সে যথেষ্ট আপশোষ করিল, এবং নিজের পোড়া কপালকে ধিক্কার দিয়া দিয়া একবারে বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু একটা সন্দেহ কাঁটার মত বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিতে লাগিল,—নিবারণ সেই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার সহিত স্বভার বিবাহ দিলে, সে তার সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি নিজের খরচায় উদ্ধার করিয়া দিবে, বিমলের সহিত স্বভার বিবাহ হইলে সে প্রতিজ্ঞা সে না রাখিতেও পারে ত!

নিবারণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আপনি একটা ট্যাক্সি করে এখুনি বেরিয়ে পড়ুন! যত টাকা লাগে দিতে রাজী আছি—তারিণী চাটুয্যেকে রাজী করে আসুন!"

কতই যেন বিব্রত এবং বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এমনিভাবে ঘনশ্যাম কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল—"গরীব লোক ব'লে এমনি করেই অপমান করতে হয়, নিবারণবাবু! গরীব হয়েই না হয় পড়েছি, তাই বলে কি মান সম্ভ্রম আত্মমর্য্যাদা এ সব আমাদের কিছুই নেই বল্‌তে চান!"

নিবারণের সত্যসত্যই কান্না আসিতেছিল—নিজের উপর তার আজ ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল মুখে কিন্তু সে একটি কথাও বলিতে পারিল না।—কিই বা বলিবে সে?

ঘনশ্যাম বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে—সে আবার বলিতে লাগিল—"করুন অত্যাচার!—গরীব হয়ে জন্মেছি যখন তখন সইতে হবে বৈকি—হাজার বার সইতে হবে!"

নিবারণ কেবল ডাকিল—"ঘনশ্যাম বাবু!" তার স্বর অশ্রুভারাক্রান্ত। ঘনশ্যাম তেমনিই বকিয়া যাইতে লাগিল—"বলুন,—তোমার সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে দেবো যে বলেছিলুম তাও রাখতে পারলুম না ঘনশ্যাম বাবু!—বলুন! বলুন!—ওঃ—গরীব বলে আমরা কি—"

অত্যন্ত করুণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে নিবারণ বলিল—"আমাকে অতটা নীচ ভাববেন না, ঘনশ্যাম বাবু! আজ রাত্রেই সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে জলগ্রহণ কর'ব—তা জানবেন!"

১২

সত্যসত্যই প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ ঘনশ্যামকে বুঝাইয়া দিয়া নিবারণ সে রাত্রে জলস্পর্শ করিয়াছিল। সর্ব্বসমেত পনের হাজার টাকার একটি চেক্ ঘনশ্যামের নামে লিখিয়া দিয়া নিবারণ সে রাত্রে খালাস পাইল, এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে ভাবিল,—এ যাত্রা সে খুব জিতিয়া গিয়াছে।

নিবারণের নিকট হইতে নগদ পনেটি হাজার টাকা বেমালুম আদায় লইয়া ঘনশ্যাম সে রাত্রে খুব খানিকটা আস্ফালন করিয়া লইল। যে-সকল আত্মীয়স্বজন তাহার দুর্ভাগ্য অপেক্ষা সৌভাগ্যের দিকে চাহিয়াই ভিতরে ভিতরে হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়া এই বিবাহটাকে অতি বড় পৈশাচিক এবং জঘন্য হৃদয়হীনতা বলিয়া চেঁচাইয়া পাড়া মাথায় করিয়াছিল, আজ তাহাদিগকে সুমুখে পাইয়া ঘনশ্যাম মনের সাধে খুব খানিকটা শুনাইয়া দিল, এবং হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, পূর্ব্ব হইতেই সে চিরউর্ব্বর মস্তিষ্কটি খেলাইয়া এমন একটা অব্যর্থ ফন্দি আঁটিয়া

রাখিয়াছিল যাহাতে এই আহাম্মক বিয়ে-পাগলা লোকটা বিবাহ-সভা হইতে নিজে হইতেই সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয় ; অথচ যে বিপুল অর্থের দিকে চাহিয়া তাহাকে দয়া করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র বরবেশে সভায় বসিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে, তা না হইলে সেকি এমনি হৃদয়হীন এবং নরাধম যে সত্যসত্যই ঘাটের মড়ার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া যক্ষের ধন আগলাইয়া বসিয়া থাকিবে ?

এবার আর কেহই তাহার বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না, এবং একবাক্যে স্বীকার করিল যে লেখাপড়া না শিখিলেও বুদ্ধিতে সে হাইকোর্টের জজেদের কান কাটিয়া দিয়া আসিতে পারে। সুভার মাকেও এবার তার স্বামীর প্রশংসা করিতে হইল।

সমস্ত গণ্ডগোল চুকাইয়া নিবারণ যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত ১টা বাজিয়া গিয়াছিল। সে নিজ কক্ষে আসিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া একটা বাতি জ্বালিল ;—তার পর কি মনে করিয়া সেটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ শয্যায় শুইয়া থাকিবার পর তার কেমন যেন দম্ আটকাইয়া যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, তার বুকের উপর কে যেন চাপিয়া বসিয়াছে, —সে শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া ছাতে উঠিয়া গেল।

—স্বপ্ন-শেষ—

চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ—কোথাও সাড়াশব্দের লেশমাত্র নাই,—কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, থম্‌থমে রাত্রি। নিবারণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—সে যেন তার মার কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ এক-সময় নিজের অজ্ঞাতসারে স্বপ্নাবিষ্টের মত সে ছাদের পূর্ব্ব-দিককার আলিসাটার ধারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।—অদূরে একটা বাড়ীর ছাতের উপর কালো একটা সামিয়ানার তলায় দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া অসংখ্য অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি ব্যস্ত হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, এবং তাহাদের দূরাগত কোলাহল স্বপ্নের মত ক্ষীণ হইয়া বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। নিবারণের মনে হইতে লাগিল—সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। সে চুপ করিয়া মোহাবিষ্টের মত সেই দিক পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ এইভাবে সে দাঁড়াইয়াছিল তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই—হঠাৎ একসময় কিসের একটা কোলাহলে সচকিত হইয়া উঠিল,—এবং চাহিয়া দেখিল,—সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট মায়াপুরীটার ছাতের উপরকার সেই অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি কখন একসময় ছাদের আলিসার ধারে কাতারে কাতারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দ্বিগুণতর ব্যস্ততাসহকারে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি উঠিয়া এই

স্বপ্নপুরীটিকে কখন এক সময় তার অজ্ঞাতসারে বাস্তব-জগতের রাশি রাশি বস্তুপিণ্ডের মাঝখানে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে নীচে নামিয়া আসিয়া নিবারণ আবার তার সেই অন্ধকার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; এবং আলো না জ্বালিয়াই হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সম্মুখের জানালাটা খোলা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া দেখা-যাইতেছিল,—স্বভাদের পূর্ব্বেকার সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা, অন্ধকারের মধ্যে কালো একটা বস্তুপিণ্ডের মত খাড়া হইয়া রহিয়াছে। সেই দিক পানে চাহিয়া হঠাৎ নিবারণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল;—তার মনে হইতে লাগিল একটা কালো দৈত্য তার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।

ছেলেবেলায় সে তার পিসীমার নিকট গল্প শুনিয়াছিল, দৈত্যেরা মায়াবলে ঘরবাড়ী পাহাড়পর্ব্বত প্রভৃতি যে কোনও রূপ গ্রহণ করিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তারপর ভ্রান্ত পথিক তাহাকে নির্জ্জীব বস্তুপিণ্ড মাত্র ভাবিয়া তখন নির্ভাবনায় পরম নিশ্চিন্ত মনে সেই পথ দিয়া যাইতে থাকে, তখন হঠাৎ একসময় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার উপর গিয়া পড়িয়া ঘাড় মটকাইয়া তার রক্ত শোষণ করে।

এই ভাঙ্গা বাড়ীটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আজ তার মনে হইতে লাগিল এও সেইরূপই কোন একটা দৈত্য,

তাহার রক্ত শোষণ করিবার জন্য ভাঙ্গাবাড়ীর রূপ ধরিয়া অন্ধকারে জড়পিণ্ডবৎ নিঃসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—ধড় মড় করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া নিবারণ ভয়-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"বেহারী, বেহারী!" এবং সে আসিতেই আলো জ্বালিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"এখুনি একটা ট্যাক্সি ডেকে আন!"

সে অবাক হইয়া নিবারণের অদ্ভুত মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"এত রাত্রে কোথায় যাবেন, বাবু?"

"হাওড়া ষ্টেশনে!"

অবাক হইয়া বিহারী বলিল—"দেশে যাবেন নাকি? কিন্তু এত রাত্রে ত কোন গাড়ী নেই।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিবারণ বলিল—"দেশে যেতে যাবো কেন? আর কোন চুলোয় কি আমার ঠাঁই নেই?—কাশী আছে, বৃন্দাবন আছে—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বিহারী বলিল—"এত রাত্রে ত কোন গাড়ীই ছাড়ে না, বাবু!"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিবারণ চেঁচাইয়া উঠিল—"আজ না ছাড়ে—কাল সকালে ছাড়বে তো?"

হাতজোড় করিয়া বিহারী বলিল—"তা, এখন থেকে ইষ্টিসনে বসে থেকে কি হবে, হুজুর?"

নিবারণ চেঁচাইয়া উঠিল—"আমার খুসি,—আমি সারা-

রাত ইষ্টিসনে বসে থাকবো—তুই ট্যাক্সি ডেকে দিবি কিনা বল ?"

*　　　*

*

পরদিন সকালে বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবার জন্ত নিবারণকে ডাকিতে আসিয়া ঘনশ্যাম দেখিল—বাড়ীর দরজায় তালা লাগান; স্থমুখের মুদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—গত-কল্য অনেক রাত্রে তিন খানা ট্যাক্সিতে মালপত্র বোঝাই করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

পথের বাঁকে

১

কাশীর হরিশ্চন্দ্র-ঘাট রোডের উপরকার একটা বাড়ীর দ্বিতলের একটা কক্ষে বসিয়া চারিটি প্রাণী তাস খেলিতেছিল। অদূরে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা লোক বালিসের উপর ক্রমাগত মুখ ঘসিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে বিড়-বিড় করিয়া মাথামুণ্ডু কি যে বকিতেছিল তা সেই জানে।

যে চারিটি প্রাণী তাস খেলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক, বাকী তিনটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটির বয়স অল্প—বড় জোর আঠার উনিশ হইবে, দেখিলে কিন্তু আরও কম বলিয়া মনে হয়। চেহারা যে খুব ভাল তা নয়,—তবে চোখ দুটো ডাগর এবং নীচেকার ঠোঁটের কুঞ্চনটুকুর মধ্যে বেশ একটু ব্যঞ্জনা আছে।

যুবতীটির সাম্‌নাসাম্‌নি যে লোকটা বসিয়াছিল, তাহার চেহারাটাকে লইয়া লোকে আর যা করে করুক, তাচ্ছিল্য করিতে যে পারিবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে

যেমন মোটা তেমনি কালো এবং তেমনি লম্বা। পরণে ফরাসডাঙ্গার মিহি জরিপাড় ধুতি, গায়ে সিল্কের পাতলা গেঞ্জি এবং গলায় একছড়া সরু সোণার হার কষ্টিপাথরে কনকরেখাটির মত মধ্যে মধ্যে চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছিল।

লোকটা জাতিতে শুঁড়ি।—আসিয়াছিল গয়ায় বাপ মায়ের পিণ্ড দিতে। স্ত্রীকে সঙ্গে আনে নাই, পাছে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত হয় ;—বাপ-মায়ের পিণ্ডদান ব্যাপার,—ছেলেখেলা ত আর নয়। যাহা হউক সেখানে বিধিমতে চৌদ্দপুরুষের পিণ্ড চট্কান শেষ করিয়া সম্প্রতি কাশীতে আসিয়াছে,—মৎলবটা দিন পনের এখানে থাকিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে যতটা পারা যায় পুণ্যসঞ্চয় করিয়া কলিকাতায় ফিরিবে।

ঘরের মধ্যে বাদবাকী যে কয়টি জীব উপস্থিত ছিল, বাবুর পরিচয়েই তাঁহাদের পরিচয়, সুতরাং অলমতি বিস্তরেণ।

তাস খেলা পুরাদমে চলিতেছিল,—হঠাৎ তাহারি মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা লম্বাগিজাংটা গেল কোথায় বল্ দেখি—সে শালা সন্দেশ চাপা পড়ল না ত ?"

শেষ পিটুটা তুলিয়া লইয়া নূতন আর এক বাজি খেলিবার জন্য তাস ভাঁজিতে ভাঁজিতে মোটা লোকটা বলিল—"সে শালা এখানে ভাল সন্দেশ না পেয়ে সটান্ কল্‌কাতায় ভীমনাগের দোকানে গিয়ে হাজির হয়েছে নিশ্চয়ই।" কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরাট মাংস-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া লোকটা বেদম হাসিতে সুরু করিয়া দিল।

মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া যে লোকটা বালিশে মুখ ঘষিতেছিল—সে সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"চোপরাও বেয়াদপ্—ব্রহ্মচর্য্য চল্‌কে যাচ্ছে, মাইরি!—নগদ পাঁচসিকের ব্রহ্মচর্য্য বাবা!"

সে কথায় কাণ না দিয়া পটলী বলিয়া উঠিল—"সত্যি লম্বাগিজাংটা গ্যালো কোথায় বল দেখি?"

মোটা লোকটা তার ছোট্ট ছোট্ট পিট্‌পিটে চোখ দুটোকে আরও ছোট্ট করিয়া মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সিঁথের সিঁদুর মুছবে না—ভয় নেই পটলী!"

ইহার উত্তরে পটলী কি বলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ সিঁড়িতে কাহার দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল, এবং পর মুহূর্ত্তেই লম্বাগিজাং তার সাত ফিট্ লম্বা বাঁকারির মত লিক্‌লিকে দেহ-যষ্টিখানিকে লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং কাহাকে কিছু বলিবার অবসর মাত্র না দিয়াই এক নিশ্বাসে আওড়াইয়া যাইতে লাগিল—"পটলী হচ্ছে কুলীন বামুনের মেয়ে। বাঁকুশালা হচ্ছে ওর বাপ্, আর আমরা হচ্ছি খুড়ো, জ্যাঠা, মেসো, পিসে—যার যা খুসী,—মনে থাকে যেন।"

সকলে প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"তার মানে?" সে কথায় কোন' উত্তর না দিয়াই সে বলিয়া উঠিল—"পটলী, তুই ও-ঘরে পালা শিগ্‌গির—না ডাকলে বেরোস্ নে খবরদার।" কথাটা শেষ করিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সিঁড়ির নিকট গিয়া উপর হইতেই হাঁক দিল—"সটান্ ওপরে

চলে আসুন, গাঙ্গুলী-মশাই,—সিদে ওপরে—ওদিকে নয়—বাঁদিকে সিঁড়ি।"

পরক্ষণেই লম্বাগিজাংএর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাঙ্গুলী মশাই নামক নূতন জীবটি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। মোটাসোটা খাটো লোকটি,—গোঁফদাড়ী কামান, কিন্তু কানে এবং নাকে অনেকখানি পোষাইয়া লইয়াছেন। পাতলা জ্যালজেলে উড়ানীর ভিতর দিয়া পৈতা এবং নেয়াপাতি ভুঁড়িটির কতকটা দেখা যাইতেছে ;—বয়স ৪০।৪৫ হইবে—দেখিতে মোটের উপর ভালই—বেশ ভদ্র লোকের মতই চেহারা। নাক মুখ চোখ সবই বেশ ধারাল—কিন্তু চোখের চাহনির মধ্যে কোথায় এমন একটা কিছু আছে যাহার দরুণ তাহার মুখখানা সব জড়াইয়া কেমন যেন বোকা-বোকা দেখায়।

ঘরে ঢুকিয়াই লম্বাগিজাং সুরু করিয়া দিল—"এরই কথা আপনাকে বলেছিলুম বঙ্ক-দা! দিগ্‌গজ কুলীন এঁরা! আমাদের পটলের সঙ্গে দিব্যি মানাবে—কি বল য়্যা?

বাঁকুচন্দ্র ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়াছিল—সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এই দিগ্‌গজ কুলীন-পুত্রটিকে যথাসম্ভব খাতির করিয়া বসাইল এবং সকলে আসন গ্রহণ করিলে গলার স্বর-টাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া তুলিয়া বলিল—"তা বাবাজীর নামটি শুনতে পাই কি?" চতুর্গুণ মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর হইল—"আজ্ঞে এ অধমের নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—আপনারা অবশ্য পরে—নকুড় বলেই ডাকবেন।"

শতকরা নিরেনব্বই জন মোটা মানুষের মত সাহা-মহাশয়েরও হাসি-রোগ ছিল—সে অতিকষ্টে এ যাত্রা নিজেকে কোন মতে সামলাইয়া লইল,—এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ খানিকটা কাসিল—গোটাকতক ঢেকুর তুলিল এবং অবশেষে বারকতক হাই তুলিয়া ধাতে ফিরিয়া আসিল।

লম্বাগিজাংটা বলিল—"কি বিনয়ী দেখেছেন বঙ্ক দা!" বাঁকুরাম উত্তর করিল—"হবে না কেন ভায়া—এত বড় বনেদী বংশের ছেলে!—তা বাবাজীর কি করা হয়?"

অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া উঠিয়া নকড়চন্দ্র উত্তর করিলেন—"প্রেফেসরি।"

"বেশ বেশ!—হিন্দু কলেজে বুঝি?"

"আজ্ঞে না, ক্ষুদিরামবাবুর ইস্কুলে।"

"তা বেশ, আমরাও বিদ্বান পাত্রই খুঁজছিলুম—তা ভালই হোল। কি বল ভায়া"—বলিয়া সাহা মহাশয়ের দিকে তাকাইতেই—তিনি কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ তাকিয়ার মধ্যে মুণ্ডটিকে যথাসম্ভব পুঁতিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাকিয়ার বাহিরে রহিলেন যে কটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—তাহাদের দুর্দ্দশার আর অন্ত রহিল না,—বিশেষ করিয়া বিপুল ভুঁড়িটির।

সে দিক হইতে দ্রুত চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া অতিকষ্টে এই অতি বড় সংক্রামক ব্যাধিটির হাত হইতে কোনও মতে আত্ম-রক্ষা করিয়া বাঁকুচন্দ্র বলিল—"তা বেশ ভালই হোল——পেটে একটু বিদ্যে না থাকলে আজকালকার দিনে—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়া নকুড়চন্দ্র বলিল—"আর একটা কথা বলছিলুম—"

"বল বাবা বল।"

নকুড়চন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল—"দেখুন,—মিথ্যে প্রবঞ্চনা এসব আমি মোটেই পছন্দ করি না—তা সে আপনারা ভালই বলুন আর মন্দই বলুন।" তারপর একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া সে আবার বলিল—"দেখুন, আমার আর এক সংসার ছিল, সে সংসার আজ অবশ্য দু'বৎসর হোলো গত হয়েছেন—বুঝলেন কি না!"

"বিলক্ষণ—বিলক্ষণ, কুলীনের ছেলের ওসব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, তাও আবার সে স্ত্রী বেঁচে নেই, হুঁ।"

কথাটা শেষ করিয়াই বাঁকুচন্দ্র লম্বাগিজাংএর দিকে চাহিয়া বলিল "তা হ'লে পটলকে একবার———"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লম্বাগিজাং এক লম্ফে পাশের ছোট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পটলীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

কন্যাকে নকুড়চন্দ্রের ঠিক সম্মুখেই বসাইয়া দেওয়া হইল। সকলে মনে করিয়াছিল নকুড়চন্দ্র পটলীকে দেখিয়া না জানি কি কাণ্ডটাই করিবে, হয়ত তাহার চতুষ্পাটি দন্ত বাহির হইয়া পড়িবে, হয়ত কৃতকৃতার্থের মত অনবরত অঙ্গ মোড়া দিয়া দিয়া সে শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলোকে খুলিয়া ফেলিবে, হয়ত শুশুকের মত অনবরত ডিগবাজী খাইতে থাকিবে এবং হয়ত

বা আরও এমন কিছু করিয়া বসিবে যাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনটাই সে করিল না, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একবারমাত্র তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "অপছন্দ করবার কিছু নেই—মিথ্যে কষ্ট দেওয়া——নিয়ে যান।"

পটলী উঠিতেছিল—লম্বাগিজাং বলিয়া উঠিল—"নাম জিজ্ঞেস কর্‌লেন না?"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নকুড়চন্দ্র বলিল—"তোমার নাম কি?—বল, বল, লজ্জা কি—আমরা সবাই তোমার আপনার লোক—কেউ ত আর পর নই—"

মাতালটা হঠাৎ ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"খবরদার—মুখ সাম্‌লে!—দুনিয়ায় আমি ছাড়া পটলীর আপনার লোক কেউ নেই—কোন' শালা না"—কথাটা শেষ করিয়া সে আবার বালিসের উপর মুখ ঘসিতে লাগিল।

পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল—সাহা মহাশয় কোমরের কসি আঁটিতে আঁটিতে ঘর হইতে মত্ত-মাতঙ্গের মত বাহির হইয়া যাইতেছে—হাসির বেগ এবার তাহাকে বেসামাল করিয়া তুলিয়াছিল।

এই বেখাপ্পা ব্যাপারটাকে কোনও রকমে মানাইয়া লইবার জন্য লম্বাগিজাং বলিয়া উঠিল—"গাঙ্গুলী মশায়ের পাগলের ওষুধ-টষুধ কিছু জানা আছে? এই দৈবটৈব,—ডাক্তারী কবরেজী ক'রে ক'রে হার মেনে গেছি, মশাই!"

ভয়ে ভয়ে সেই অদ্ভুত জীবটির দিকে পিট্ পিট্ করিয়া

চাহিতে চাহিতে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে নকুড়চন্দ্র বলিল—"একেবারে বদ্ধ পাগল—ওঁকে ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পটলী পার্শ্বোপবিষ্ট বাঁকুচন্দ্রকে অলক্ষিতে টিপিয়া দিল। তাহার মুখের দিকে একবারমাত্র চাহিয়াই বাঁকু বলিয়া উঠিল—"তাহ'লে বাবাজীর অনুমতি হ'লে পটল এখন—"

"স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে !—মেয়েদের কষ্ট দেওয়াটা আমি,—বুঝলেন কি না !"

কেহ কিছু বুঝিল কি না ভগবানই জানেন—কিন্তু পটল সুন্দরী বুঝিল—কত বড় ফাঁড়ার হাত হইতে সে বাঁচিয়া গেল। পটলী চলিয়া যাইবার পর লম্বাগিন্নাং এইবার সোজা-সুজি কাজের কথা পাড়িয়া বসিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল—মৌতাতের সময় যায়-যায়,—তার আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।।

"তাহ'লে পাঁজিপুঁথি দেখে একটা শুভদিন স্থির ক'রে আপনাকে খবর দেবো এখন ; আর দেনা-পাওনার কথা—সে ত আপনাকে পথেই সব বলেছি। দাদার আমার ঐ একমাত্র সন্তান,—তাহলে কাল সন্ধ্যা নাগাদ আপনার ওখানে—"

কথাটা শেষ না করিতে দিয়াই নকুড়চন্দ্র বলিল—"হাতে পাঁজি মঙ্গলবার মশাই !" কথাটা শেষ করিয়াই সে একটি ছেড়া পকেট পঞ্জিকা তাহার উড়ানীর মধ্যে হাত চালাইয়া দিয়া কোথা হইতে বাহির করিয়া ফেলিল।

অতঃপর দিনস্থির হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। আগামী শনিবার দিন ভাল—লগ্নও অনেক আছে,—স্থির হইল ১২টার লগ্নে বিবাহ হইবে।

"তাহলে আজকে এই পর্য্যন্ত—" বলিয়া নকুড়চন্দ্রের মুখের দিকে একবারমাত্র চাহিয়াই লম্বাগিজাং হতাশ হইয়া পড়িল।——উঠিবার বা নড়িবার কোনরূপ লক্ষণ লোকটার শ্রীমুখপঙ্কজের ত্রিসীমানার মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইল না।

বেগতিক দেখিয়া বাঁকুচন্দ্র বলিল—"তুমি তাহলে বাবাজীকে একটু এগিয়ে দিয়ে এসো—সিঁড়িটা কিন্তু বড্ড অন্ধকার একটু দেখে শুনে নিয়ে যেও!" কথাটা শেষ করিয়াই বাঁকুচন্দ্র নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অগত্যা বাবাজী উঠিলেন। লম্বাগিজাং আগে হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; নকুড়চন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য চৌকাঠে পা দিতেই সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে সুরু করিয়া দিল—তার আর একমুহূর্ত্ত সবুর সহিতেছিল না। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপ অবধি নামিয়া গিয়াও সে পশ্চাতে কোনরূপ পদশব্দ শুনিতে পাইল না;—উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, নকুড়চন্দ্র আবার পূর্ব্বস্থানে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া বসিয়াছেন এবং ধীরে সুস্থে বাক্যালাপ সুরু করিয়া দিয়াছেন,—আর বাঁকুচন্দ্র উপয়ান্তর না দেখিয়া বেয়াকুবের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল হুঁ-হাঁ দিয়া যাইতেছে।

নকুড়চন্দ্র বলিতেছিল—"আসল কথা কি জানেন—আমি

একটু গোপনে কাজটা সম্পন্ন কর্‌তে চাই—বরযাত্রীর টাত্রীর কেউ আসবে না—পুরুত নাপিত পর্য্যন্ত না—সে সব আপনারাই ঠিক করে রাখবেন,—আমি শুধু চুপি চুপি এসে বিয়েটি করে যাব—বুঝলেন কিনা!—আপনারা হয়ত জিজ্ঞেস করবেন—এরূপ কর্‌বার কারণটা কি—"

বাধা দিয়া বাঁকুচন্দ্র বলিল—"বিলক্ষণ বিলক্ষণ!—মানুষের কত সুবিধে অসুবিধে থাক্‌তে পারে,—বাবাজীকে আর কারণ দেখাতে হবে না!—তাহ'লে শনিবার রাত ১২টার লগ্নই ঠিক রইল—সিঁড়িটা বড্ড অন্ধকার, নামবার সময় একটু দেখে নেবো বাবাজী—"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নকুড়চন্দ্র বলিতে লাগিল—"দেখুন, কারণ বিনা কোন কায্যই হয় না!"

বাধা দিয়া লম্বাগিজাং বলিয়া উঠিল—"বটেই ত! এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে; তবে কিনা আর একদিন শুনলেই চলবে'খন,—এখন ত প্রায় রোজই দেখা হবে।"

নকুড়চন্দ্র এতক্ষণ এলো-মেলো ভাবে বসিয়াছিলেন, এইবার পায়ের উপর পা দিয়া দিব্য গুছাইয়া বসিলেন, এবং হাত মুখ নাড়িয়া আরম্ভ করিলেন—"ওসব কাজের কথা নয় মশাই!—দোষই বলুন আর গুণই বলুন, লুকোচুরি জিনিষটা আমি মোটেই পছন্দ করি না—বুঝলেন কিনা!"

লম্বাগিজাং কিছু বুঝিল কিনা ভগবানই জানেন—কিন্তু অতঃপর তাহাকে একটি গোটা মহাভারত মরদের মত খাড়া দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল।

নকুড়চন্দ্র আরম্ভ করিলেন—"তবে বলি শুনুন,—বছরখানেক আগে আর এক জায়গায় আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—সব ঠিক্ ঠাক্, বুঝলেন কিনা!"

বাঁকুচন্দ্র বলিল—"বুঝতে পেরেছি;—তার পর ভেঙ্গে গেল আর কি!"

"আজ্ঞে হাঁ্যা—ভেঙ্গে গেল।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া লম্বাগিজাং বলিল—"কথায় বলে জন্ম মৃত্যু বিবাহ—"

আরও ঝাঁকিয়া বসিয়া নকুড়চন্দ্র আরম্ভ করিল—"যা বলেছেন—জন্ম মৃত্যু বিবাহ—ওর ওপর মানুষের হাত নেই। এক্ষেত্রেও তাই হোলো;—চোখের সামনে ভেঙ্গে গেল—ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলুম—কি কর্‌তে পারলুম বলুন?—ব্যাপারটা তবে খুলে বলি শুনুন"—বলিয়া নকুড়চন্দ্র উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া যুদ্ধপর্ব্ব সুরু করিলেন। লম্বাগিজাং এবং বাঁকুচন্দ্র হাল ছাড়িয়া দিল। "তবে বলি শুনুন—সব ঠিক্ ঠাক্। পাড়ার ছেলেরাই সম্বন্ধ ঠিক করেছিল—খাসা মেয়ে—সেও বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান—বুঝলেন কিনা—"

বাঁকুচন্দ্র বা লম্বাগিজাং কেহই কোন উত্তর দিল না।

নকুড়চন্দ্র আবার আরম্ভ করিল—"কাল যেন বিয়ে—আজ ঠিক এমনি সময়টায় বাসায় বসে আছি;—কিছুক্ষণ হোল পাড়ার ছেলেরা গড়ের বাদ্যি আর রোসনাইওয়ালাদের অগ্রিম বায়না দিয়ে আসবে বলে ৩০ টাকা নিয়ে গেছে;—চারদিকে

বিয়ের লগন্সা,—আগে থাকতে বায়না দিয়ে না রাখলে চল্‌বে কেন বলুন !—আপনারা হয়ত জিজ্ঞেসা করবেন—অত ঘটাঘটির কি দরকার ছিল—"

বাধা দিয়া লম্বাগিজাং বলিয়া উঠিল—"আজ্ঞে না—তা আমরা আদবেই জিজ্ঞেসা করব না—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"তবু বলি"—বলিয়া নকুড়চন্দ্র আরম্ভ করিল—"আমার ওসব সখ্‌ টক্‌ নেই বুঝেছেন কিনা—মেয়ের বাপ ধরে বসল—রোসনাই করে বর না এলে—বুঝেছেন কিনা—একমাত্র মেয়ে—একটু সাধ আহ্লাদ—বুঝেছেন কি না—"

কেহ কোন কথা বলিল না—লম্বাগিজাং এবং বাঁকুচন্দ্র কেবল হতাশ ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল—সে দৃষ্টি যেমন করুণ, তেমনি বিষাদময়।

নকুড়চন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল—"হ্যা কি বলছিলুম—বাইরের ঘরে বসে আছি—কাল বিয়ে কত ভাবনা মাথায়—বুঝেছেন কিনা !—ও মশাই, কোথা থেকে দুষমনের মতন চেহারা এক ব্যাটা এসে হাজির—আমার ত চক্ষু চড়ক গাছ ; সে এসে করলে কি জানেন—কড় কড় করে আমার বাঁ হাতটা না ধরে তিন হ্যাচকা মেরে বল্লে—'খবরদার—মাধুরীকে যদি বিয়ে করবি ত খুন করে ফেলব—ছেলেবেলা থেকে ওকে আমি জীবন-যৌবন সমর্পণ করে বসে আছি তা জানিস্‌!' তার পর মশাই কোত্থেকে একটা প্রকাণ্ড ছুরি না বার করে বল্লে—'ও

মুখো হয়েছ কি—এই ছুরি দিয়ে তোমার নাড়িভুঁড়ি'—বুঝেছেন কিনা !"

সহসা অত্যন্ত বেয়াড়া এবং বাজখাই কণ্ঠে মাতালটা চেঁচাইয়া উঠিল—"পটলীকে বিয়ে কর্‌তে হয় কর, আপত্তি নেই—কিন্তু গাত্রস্পর্শ বা রাত্রিবাস করেছ কি খুন করেছি—সতীলক্ষ্মীর ওপর অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না বাবা—তাতে ফাঁসী যেতে হয় সো ভী আচ্ছা !"

সেই দিক পানে সভয়ে চাহিতে চাহিতে নকুড়চন্দ্র সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাগ বুঝিয়া লম্বাগিজাং বলিয়া উঠিল—"সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে বাদ বাকীটা শোনা যাবে এখন—আপনিও আসুন. না বঙ্ক-দা—সিঁড়িটা কিন্তু একটু দেখে নামবেন নকুড় বাবু—"

নকুড়চন্দ্র এবার আর আপত্তি করিল না—সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সে বলিয়া যাইতে লাগিল—এর পর আর বিয়ে করি কোন্ সাহসে বলুন !—মাঝ থেকে ৩০টা টাকা বুঝলেন কিনা,—আর পাড়ার ছেলেদেরই বা দোষ দিই কি করে বলুন—বায়না করে ফেলেছে—সেটা আর ফেরত চাইবে কোন্ মুখে—"

ইতিমধ্যে তাহারা সদর দরজার নিকট আসিয়া পৌছিয়াছিল,—লম্বাগিজাং বলিল—"বুঝতে পেরেছি—সেই জন্যেই এবার আর পাঁচ কাণ কর্‌তে চান্ না—তা সে না করাই ভাল,—তা হলে ঐ কথাই রইল—ইতিমধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করব'খন।"

সে ভাবিয়াছিল—ইহার পর পরস্পর নমস্কার এবং বিদায়-সম্ভাষণের পালাটা শেষ হইলেই যবনিকা পতন হইবে—কিন্তু নকুড়চন্দ্র সহসা আরম্ভ করিল—"মনে কর্‌বেন না আমি ভয় পেয়েছিলুম—আসল কথা কি জানেন—"

কিন্তু আসল কথাটা আর বলা হইল না—হঠাৎ দ্বিতলের একটা জানালা খুলিয়া গেল—এবং সেই মাতালটা রাস্তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"খবরদার—খুন করে ফেলব বলছি—এক্কেবারে দুঃশাসনের রক্তপান!"

"আচ্ছা নমস্কার মশাই—শনিবারেই তাহলে—" কথাটা শেষ না করিয়াই নকুড়চন্দ্র হন্ হন্ করিয়া বেগে চলিতে সুরু করিয়া দিলেন। লম্বাগিজাং এবং বাঁকুচন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল;—তিন লম্ফে সিঁড়ি পার হইয়া—উপরে আসিয়া দেখে, বড়বাবু এবং পটলী হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছে। সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া ঝড়ের মত উদ্দামভাবে তাহারা পাশের ছোট ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং মিনিট কয়েক পরেই বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"এখন হাস বাবা যত পার!—শালা পিত্তি পড়িয়ে তবে ছাড়লে—শালার ঘরের শালারে আমার।"

হাসিতে হাসিতে বড়বাবু বলিল—"বাপ্—আমার যা দুর্দ্দশা হয়েছিল, কি বলব মাইরি—শেষকালে ভাবলুম পেট ফেটে না মরে যাই।"

পটলী বলিল—"আমারও প্রায় তাই,—অতি কষ্টে হাসি সামলে বসেছিলুম—শেষকালটায় আর পাল্লুম না,—তখন বাঁকুকে একটা

৬

খোঁচা দিলুম—কি ভাগ্যিস্ বাঁকু আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিল—তা না হলেই হয়েছিল আর কি,—ঠিক দম্ আটকে মরে যেতুম।"

লম্বাগিজাং বলিল—"কি রকম চিজ্‌খানি আমদানি করেছি বল বাবা!"

বড়বাবু বলিল—"তা একশ বার তারিফ কর্‌তে হবে!" বাঁকুচন্দ্র বলিল—"শালা কি নিরেট্ রে বাবা।—এই সেদিন পাড়ার ছেলেরা ক্যাবলা বানিয়ে ৩০ টাকা ভোগা দিলে—তবু ব্যাটার চেতনা হোলো না—দিব্যি বিশ্বাস করে গেল।"

লম্বাগিজাং বলিল—"আমাদের কিন্তু বিয়ে—মায় ফুলশয্যে পর্য্যন্ত গড়াতে হবে বড়বাবু!"

খুব একটা বীরত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত করিয়া বড়বাবু বলিল—"নিশ্চয়ই!—যখন ধরেছি তখন চূড়ান্ত ক'রে ছাড়ব—তাতে দু-চারশ টাকা বেরিয়ে যায় কুছ পরোয়া নেই—ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কর্‌তে রাজী নই বাবা!"

লম্বাগিজাং বলিল—"নিশ্চয়ই!—একি নিলুমল্লিকের বাগান-বাড়ী দেওয়া!—শালা ৫০ টাকার একটা নোট বার করে বলে কিনা এর ভিতর চালিয়ে নিতে হবে,—তক্ষুণি মুখের উপর বলে দিলুম—তোর নোটে আমি—" পটলী বলিল—"তাত হোলো,—কিন্তু আমার প্রাণটা যে যাবে!"

মুখখানা বিকৃত করিয়া লম্বাগিজাং বলিয়া উঠিল—"মাইরি?—কি সতীলক্ষ্মী আমার রে!—লজ্জায় গেলেন একেবারে—লে লে আদিখ্যেতা রাখ্।"

২

শনিবার। রাত প্রায় ১১টা হইবে,—নকুড়চন্দ্র আসিয়া দ্বিতলের হল-ঘরটায় বরশয্যায় বসিয়াছে। বাড়ী হইতে সে সাধারণ পোষাকেই আসিয়াছিল—এখানে আসার পর চেলির কাপড়, গরদের পাঞ্জাবী, জরিপাড় সিল্কের চাদর প্রভৃতি শ্রীঅঙ্গে উঠিয়াছে। হলঘরটা দস্তরমত সাজান হইয়াছে—কোথাও অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই।—

বরযাত্রী মাত্র একজন আসিয়াছিল—একটি ৫ বৎসরের শিশু। পরণে একখানি কোরা লাল পেড়ে ধুতি—গায়ে অনেক-কালের পুরাণ লাল সিল্কের একটি পাঞ্জাবী—স্থানে স্থানে পোকায় কাটিয়া গিয়াছে। ছেলেটি বড্ড রোগা এবং ক্ষীণজীবী —মুখখানি কিন্তু ভারি সুন্দর। ভাসা ভাসা ডাগর চোখদুটি সর্ব্বদাই যেন ছল্ ছল্ করিতেছে এবং তার সেই স্বাস্থ্যহীন ম্লান মুখখানির উপর একটী করুণ বিষাদের ছায়া আঁকিয়া দিয়াছে। ছেলেটী চুপ করিয়া নকুড়চন্দ্রের পাশে বসিয়াছিল। হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল—"কৈ মা এলো না বাবা?"

তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে নকুড় বলিল—"এই এলো বলে!—তোর বুঝি আর দেরী সইছে না রে ভুলো—য়্যাঁ!" ছেলেটি কোন কথা বলিল না—কেবল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আজ দু'বৎসর হইল তার মা মারা গিয়াছে।—সে কিন্তু ইহার কিছুই জানিত না—বুঝিত না!

এইটুকু কেবল জানিত—একদিন ভোরবেলা শয্যা হইতে উঠিয়া মাকে ডাকিতেই তাহাদের পাড়ার একজন স্ত্রীলোক দৌড়িয়া আসিয়া তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তার পর একটু বেলা হইতেই তার বাপ কোথা হইতে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া ছোট ছেলের মত করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—সে জিজ্ঞাসা করিল—"মা কোথায়?"—তার বাপ কোন উত্তর দিল না—আরও জোরে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তার পর কতবার সে তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"মা কবে আসবে বাবা?"

তার বাপ বলিত—"এইবার আসবে!"

এমনি করিয়া দু-দুটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—মার স্মৃতি তার ক্ষুদ্র বুকখানি হইতে অনেকখানি মুছিয়া আসিয়াছিল। ইদানীং সে তার মার কথা বড় একটা জিজ্ঞাসা করিত না—কখন সখন যদি বা করিত—সেরূপ ব্যাকুলতার সহিত নয়। এমনি করিয়া সে তার মাকে অনেকটা ভুলিয়া আসিতেছিল—

হঠাৎ আজ কয়দিন হইতে তার এই স্বপ্ন স্মৃতিটাকে জাগাইয়া দিবার জন্য তার বাপ কেন যে এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহা ভগবানই জানেন। তার মা নাকি ফিরিয়া আসিতেছে ;—এবার নাকি তাহাকে ছাড়িয়া সে আর কোথায়ও যাইবে না—এক মুহূর্ত্তের জন্যও না। তাহাকে কত আদর করিবে—কত চুমা খাইবে—এবং কাঁদিলেই বুকের মধ্যে টানিয়া লইবে—এমনি আরো কত কি! মার চেহারা ইদানীং প্রায় সে ভুলিয়া গিয়াছিল—আজ কয়দিন হইতে অনেক চেষ্টা করিয়া সে তার ছোট্ট বুকখানির মধ্যে মোটামুটি একটা ছবি আঁকিয়া লইয়াছে—খুব অস্পষ্ট—খুব আবছা।

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত খুব খানিকটা হাঁক ডাক করিয়া লম্বাগিজাং বর লইয়া গেল—ভুলোও তার বাপের হাতটি ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিল—তার দারুণ ইচ্ছা যাইতেছিল বাপকে জিজ্ঞাসা করে—তাহারা তার মার কাছে যাইতেছে নাকি! —কিন্তু লোকজন দেখিয়া সে কেমন জড় সড় হইয়া গিয়াছিল। —তার পর স্বপ্ন—একেবারে স্বপ্ন!—একটা ছোট ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সে দেখে—তার মা সাজিয়া গুজিয়া ঘোমটা দিয়া একটা পিঁড়ির উপর বসিয়া রহিয়াছে; তার পর তার বাপ তার মার খুব নিকটেই আর একটা পিঁড়িতে গিয়া বসিল—এবং তাহাকেও হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া লইল,—অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"মা নাকি বাবা?"

"হ্যাঁ—মা, যা না—ভয় কি—কোলে বসগে যা না রে পাগ্‌লা।"

তার কিন্তু যাইতে পা সরিল না—কৈ তার মা ত তাকে ডাকিল না—তার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না ত!—তার ভাল লাগিতেছিল না—সে তার বাপের কোলের কাছে আরও নিবিড় ভাবে ঘেঁসিয়া বসিল।

পুরোহিত হইয়াছিল সে দিনকার সেই মাতালটা।—অবশ্য চিনিবার উপায় নাই—সে দিন তার প্রকাণ্ড গোঁফ ছিল—আজ সকালে কামাইয়া ফেলিয়াছে। সে মাথা মুণ্ড যা তা' কতকগুলো মন্ত্র পড়াইল;—সম্প্রদান করিল বাঁকু।

বড়বাবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে লম্বাগিজাংএর কানে কানে বলিতেছিলেন—"অনুষ্ঠানের ত্রুটি একটু হয়নি বাবা—একি তোমার নিলুমল্লিকের গার্ডেনপার্টি পেয়েছ—য্যাঃ!

লম্বাগিজাং বলিল—"নিশ্চয়ই!—আসরে যখন নামা গেছে—তখন চূড়ান্ত না করে ছাড়া হবে না বাবা!—মাইরি বলছি বড়-বাবু, আমার যেন মনে হচ্ছে—পটুলীর সত্যি সত্যি বিয়ে হচ্ছে!"

বড়বাবু সগর্ব্বে বলিল—"তবে আর বাহাদুরীটা কি!"

মন্ত্র পড়া শেষ হইয়া গেল। স্ত্রী-আচার ব্যাপারটা অবশ্য ফাঁক পড়িল, কিন্তু বর বড় কি কনে বড় এ সমস্যাটার সমাধান বাকী রহিল না—সাতপাক ঘুরানও যথারীতি হইয়া গেল—অবশেষে চারি চক্ষুর মিলনও বাদ পড়িল না।

ছেলেটি বরাবর তার বাপের পাশে চুপটি করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল—একবার যেন তার মনে

হইল—তার মা ঘোমটার ভিতর হইতে তার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছে—সে চাহনি বড় সুন্দর—বড় করুণ!—কিন্তু সে চকিতের জন্য।

তার পর বর-কনে বাসর ঘরে গিয়া বসিল। মকমলের শয্যা,—সাটিনের তাকিয়া, তাহাতে জরির বিচিত্র কারুকার্য্য।—

ভুলোকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া নকুড় বলিল—"তোর মার কাছে গেলিনে ভুলো?"—ভুলো তার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বড়বাবু দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল—সে হঠাৎ চাপিতে না পারিয়া বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিল। লম্বাগিজাংএর অবস্থাও কাহিল হইয়া আসিয়াছিল—সে হঠাৎ বড়বাবুর হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে একবারে পাশের ঘরে নিয়া গিয়া ফেলিল, এবং মেঝের উপর পড়িয়া লুটোপুটি খাইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

নকুড়চন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল—ভুলোর ত কথাই নাই—সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তার বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘরের মধ্যে ছিল কেবল কন্যাকর্ত্তা বাঁকুচন্দ্র। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া নকুড় বলিল—"মা হারা ছেলে কিনা—সকাল থেকে ওকে বলে রেখেছি আজ তোর মা আসবে—বুঝেছেন কিনা!"—

বাঁকুচন্দ্রেরও হাসি আসিতেছিল—সে অতিকষ্টে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"বটেই ত বটেই ত!—তা আমি একবার বাইরে

থেকে আসছি বাবাজী,—তোমার ত আর শালী শালা এখানে কেউ নেই যে আমোদ আহ্লাদ করবে—যাক্ দেশে গিয়ে এক-দিন—" কথাটা শেষ না করিয়াই বাঁকুচন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পাশের ঘরে গিয়ে বদ্ধ হাসির বেগ মুক্ত করিয়া দিয়া দম ছাড়িয়া বাঁচিল।

হাসির বেগটা কথঞ্চিৎ কমিলে সে বলিল—"এখন কি করা যায় বল দেখি ?"

লম্বাগিজাং বলিল—"কি আর করা যাবে ?—যখন এতদূর গড়িয়েছে—তখন আরও খানিকটা গড়াতে দেওয়া যাক্। দেখাই যাক্ না ব্যাটার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত !—পটুলীটা কিন্তু সাবাস্ মেয়ে বাবা !—কার সাধ্যি ধরে ভদ্র ঘরের মেয়ে নয় !—কি রকম লজ্জাশীলাটির মতন বসে আছে—একবারে হুবহু বিয়ের ক'নেটি—মায় চোখের ভাবটি পর্য্যন্ত !"

বাঁকুচন্দ্র বলিল—"ওর মা কত বড় ছেনাল ছিল,—সেটা ভাব একবার !"

বড়বাবু বলিল—"বাঁকুরও বাহাদুরী আছে কিন্তু—পাকা মুরুব্বির ভাবটি কেয়া বজায় রেখে এসেছে বল্ দেখি—কে বলবে ও আমাদের বাঁকুচন্দ্র !"

লম্বাগিজাং বলিল—"আমিও ঠিক পারতুম—মাত্রাটা যে আজ একটু বেশী হয়ে পড়েছে—নইলে—"

বাঁকু বলিল—"তা ত বুঝলুম—কিন্তু এখন আমাদের কি করতে হবে বল দেখি—আমার ত শরীর বইছে না বাবা !"

বড়বাবু বলিল—"বাঃ আসল কাজই ত এখনও বাকী রয়েছে ; —বর কনেকে ঘরে শুইয়ে আড়ি পাত্‌তে হবে মাইরি !—তা না হলে আর মজাটা কি হোলো !"

লম্বাগিজাং একেবারে লাফাইয়া উঠিল—"ঠিক বলেছ বড়-বাবু,—বারান্দার দিকের খড়খড়ির পাখী তুলে দেখতে হবে শালা করে কি !—ওঃ সে যা মজা হবে মাইরি !—চিরকাল গল্প কর্‌তে পারা যাবে যে, হাঁ একটা নূতন কিছু করা গেছে !—স্বধু টাকা থাক্‌লেই কাপ্তেনী করা যায় না বাবা—তার সঙ্গে রসজ্ঞান চাই ;—এ সব কি আর নিলুমল্লিকের কাজ।—সাধে বাবাজীবন যৌবন তোমাকে সমর্পণ করে দেউলে হয়ে বসে আছি বড়বাবু—" বলিয়াই সে বড়বাবুকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিয়া অত্যন্ত জোরে জোরে সশব্দে চুমা খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এ দিকে বাসরঘরে বসিয়া পটলী হাঁফাইয়া উঠিতেছিল,—তার মনে হইতেছিল।—ছুটিয়া কোথাও পলাইয়া যায়।—একি করিতেছে সে।—এমন ধারাটা সে যে স্বপ্নেও কখন ভাবিতে পারে নাই—তার কান্না পাইতে লাগিল।

নকুড়চন্দ্র বলিতেছিল—"দূর পাগ্‌লা ! মার কাছে যাবি তাতে আবার ভয় কিসের ?—যা না যাঃ !"—তার পর এদিক ওদিক চাহিয়া অত্যন্ত মৃদু চাপা কণ্ঠে বলিল—"শুন্‌ছ ! তুমি একটু আদর করে ওকে একটিবার কোলে তুলে নাও—লক্ষীটি !—সকাল থেকে ও মার কাছে যাব, মার কাছে যাব করে একবারে অস্থির হয়ে রয়েছে—"

পটুলী কিন্তু নড়িল না—কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। মনটা তার শত সহস্র বাহু হইয়া এই শীর্ণ মাতৃহারা শিশুটিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য বার বার প্রসারিত হইতে চাহিতেছিল—কিন্তু তারপর ?—তারপর চারিদিক হইতে বিদ্রূপের হাসিতে বাড়ীখানা ফাটিয়া যাইবে—অসহ্য অসহ্য !—তার মনে হইতেছিল—ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়,—কিন্তু যাইবেই বা কোথায় ? এখুনি সকলে মিলিয়া জোর করিয়া তাহাকে আবার ঘরের মধ্যে আনিয়া পুরিয়া দিবে এবং তার পর হয়ত এমন একটা কিছু কাণ্ড করিবে যাহা কল্পনা করিতেও তার ভয় হয়। এখনি হয়ত এক নিমিষে সমস্ত রহস্য ভাঙ্গিয়া দিবে—হয়ত বেচারা নিরীহ ব্রাহ্মণকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া ক্ষেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিবে এবং খুব একটা বাহাদুরী করিতেছে মনে করিয়া ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে হয়ত জাগাইয়া তুলিবে।—আর ঐ শীর্ণ মাতৃহারা শিশুটি !—পটুলী সহসা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।—হয়ত লোকের কোলাহল এবং ঠেলাঠেলিতে বাপের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্র প্রাণটি তার কখন এক সময় নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে—কেহ টেরও পাইবে না।—পটুলীর ইচ্ছা যাইতে লাগিল চীৎকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠে।

হঠাৎ বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। পরমুহূর্ত্তেই বাঁকুচন্দ্র আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল—"শুধু শুধু আর রাত জেগে কষ্ট পাওয়া কেন বাবাজী—আমি বলি কি হুড়কো

বন্ধ করে শুয়ে পড়!—তুইও শুয়ে পড় পটলী, তোর আবার রাত জাগা অভ্যেস নেই—রাতও ত বড় কম হোল না—" বলিতে বলিতে বাঁকুচন্দ্র অদৃশ্য হইয়া গেল।

পটলীর বুকটা হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া উঠিল—চাহিয়া দেখে—কখন এক সময় হুড়কো দিয়া ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে তাহার অতি নিকটে আসিয়া বসিয়াছে। "ও কি কাঁদছ নাকি?" বলিয়া নকুড় তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত দিতেই সে ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে গিয়া প্রাণপণ বলে নিজেকে সামলাইয়া লইল। পরমুহূর্ত্তেই কাহার কোমল স্পর্শে শিহরিয়া চাহিয়া দেখে—কখন এক সময় চুপে চুপে সেই শীর্ণ মাতৃহারা শিশুটি নীরবে তার কোলের উপর আসিয়া বসিয়াছে। প্রাণপণ বলে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পটলী পাঁচ বৎসরের ছোট্ট মেয়েটির মত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর একজনের চাপা কান্না তার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল।

কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল—একেবারে গভীর নিস্তব্ধতা!—কোথায়ও একটু শব্দ নাই—কেবল পাশের বারান্দা হইতে কাহাদের চাপা হাসির আওয়াজ মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

হঠাৎ এক সময় ভাঙ্গা সজল কণ্ঠে নকুড় ডাকিল—"ভেলুর মা!" অত্যন্ত চাপা এবং ভাঙ্গা কণ্ঠে উত্তর আসিল—"কি!"

"তোমার কষ্ট হচ্ছে নয়?—শুয়ে পড়। আমি আলোটা নিবিয়ে দিই—"

পাশের বারান্দার চাপা হাসি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। নকুড়-চন্দ্র আলোটা নিবাইয়া দিয়া আসিয়া শুইল—ইতিপূর্ব্বেই ভুলোকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া পটলী শুইয়া পড়িয়াছিল; সে মধ্যে মধ্যে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া ধরিতেছিল।

কতক্ষণ পরে নকুড় আবার ডাকিল—"ভেলুর মা!" অত্যন্ত শান্ত পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর আসিল—"কি?"

"ভেলু ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?"

"না"—বলিয়া পটলী ভুলোকে আরও নিবিড় ভাবে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

নকুড় বলিল—"ঘুম পাচ্ছে বুঝি তোমার?"

"না—আপনি ঘুমোন।"

নকুড় কিন্তু ঘুমাইল না—সে কত কি মাথামুণ্ড বকিয়া যাইতে লাগিল।—কেমন করিয়া তাহারা দুজনে নূতন সংসারটি গড়িয়া তুলিবে—কেমন করিয়া তাহারা ভুলোকে জানিতেই দিবে না তার মা নাই। তারপর তাহাদের যখন সন্তান-সন্ততি জন্মাইবে, তখন তাহারাও জানিবে ভেলু তাহাদের সহোদর—এমনি আবোল তাবোল কত কি কল্পনা—যাহার কোন ভিত্তিই নাই—অথচ যাহা একটি রাত্রের জন্য সব চেয়ে সত্যিকারের বস্তু।

বারান্দার হাস্য-কোলাহল কখন থামিয়া গিয়াছিল—কেবল মধ্যে মধ্যে পাশের ঘর হইতে জড়িত কণ্ঠের বাগ্‌বিতণ্ডা অস্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

তারপর নকুড়চন্দ্র তার পূর্ব্বস্ত্রীর কথা পাড়িল—তাহাকে

কত ভালই না সে বাসিত—পটলীকে সে তেমনি করিয়াই ভাল-বাসিবে। সেবার কে একজন গণৎকার তাহাকে বলিয়াছিল—তার স্ত্রীর প্রকাণ্ড একটা ফাঁড়া আছে—রক্ষাকবচ ধারণ না করাইলে কি হয় বলা যায় না—সে তার কথা বিশ্বাস করে নাই।—এবার কিন্তু সে ঠেকিয়া শিখিয়াছে—সে গণৎকারের ঠিকানা তার জানা আছে—কালই গিয়া সে রক্ষা কবচ তৈরী করাইয়া লইয়া আসিবে—এমনি কত কি সে বকিয়া যাইতে লাগিল—কত কল্পনা—কত স্বপ্ন—পটলীর ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল।

তারপর কখন এক সময় নকুড় ঘুমাইয়া পড়িল—অন্ধকার ঘরখানা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

একটি রাত্রি—কেবল একটি রাত্রির বিশ্রাম;—তার পর আবার সেই শান্তিহীন বিরামহীন উদ্দেশ্যহীন একঘেয়ে পথ-যাত্রা।—কোথায় এর শেষ তাহা কে জানে—তার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। নিদ্রিত ভূলোকে বুকের মধ্যে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া পটলী ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

*　　*

*

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি।—পটলী ধীরে ধীরে উঠিল—ধীরে—অতি ধীরে ঘরের কপাট খুলিয়া সম্মুখের খোলা ছাতটার উপর আসিয়া সে দাঁড়াইল।—চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ—কোথাও

জাগরণের সাড়াটি পর্য্যন্ত নাই—কেবল দূরে—অনেক দূরে কোন্ এক দেবালয় হইতে নহবতের ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরটুকু বাতাসে ফিরিতেছিল। পটলী ছাদের আলিসাটার ধারে নীরবে আসিয়া দাঁড়াইল;—যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার! ঠিক্ এমনি গভীর নিস্তব্ধ এক অন্ধকার রজনীতে তার মা হয়ত গৃহত্যাগ করিয়াছিল—পটলীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল —সেও কি তবে——?—হঠাৎ কি মনে করিয়া বাসরঘরের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই তার মনে হইল—সে ঘরখানা যেন কতদূরে সরিয়া গিয়াছে—আর তাহার ভিতর হইতে যেন একটি অসহায় শিশুর ক্ষীণ কাতর আর্ত্তনাদ অনেকদূর হইতে বাতাসে অস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে।—সে ঊর্দ্ধমুখে একবার আকাশের দিকে তাকাইল। মাথার উপরকার লক্ষ-নক্ষত্র যেন একযোগে বলিয়া উঠিল,—কত যুগের কত পথহারা নাবিককে অকূল-সমুদ্রে পথ দেখাইয়া আসিয়াছে যে তারাটি আমাদের মধ্যে—তাহাকে তোমার পথের কথা জিজ্ঞাসা করেছি —সে শুধু বল্লে—জানি না।

* *

*

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—হলঘরের মধ্যে ছটি প্রাণী মড়ার মত ঘাড়াঘাড়ি হইয়া ঘুমাইতেছিল। এককোণে একটা হ্যারিকেন একরাশ ভূষা উড়াইয়া নিব নিব করিয়া

জ্বলিতেছে। সেই আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে লোক-গুলোকে ঠিক যেন ভূতের মত দেখাইতেছিল।

অন্ধকারে একটি স্ত্রীলোক নীরবে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তারপর হেঁট হইয়া একবার কি দেখিয়া লইয়া একটি লোকের মাথার শিয়রে আসিয়া বসিয়া তাহাকে খুব জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। লোকটা ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া—সভয়ে বলিয়া উঠিল—"কে ?—" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল—দুই হাতে প্রাণপণে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত চাপা-কণ্ঠে স্ত্রীলোকটি বলিল—"চেঁচিও না—আমি পটলী !"

সে স্বর এত গম্ভীর এবং সংযত যে লম্বাগিজাং ভয় পাইয়া গেল—ভূতাবিষ্টের মত সে পটলীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ছাদের উপর আসিয়া পটলী বলিল—"আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল।"

লম্বাগিজাংএর তখন পর্য্যন্ত নেশার ঝোঁক সম্পূর্ণ কাটে নাই—অন্ধকারে পটলীর মুখ যেটুকু দেখা যাইতেছিল—তাহা কোন জ্যান্ত মানুষের বলিয়া তার মনে হইল না।

পটলী আবার বলিল—"দুজনের ট্রেণভাড়া ছাড়াও পাঁচ টাকা আমার সঙ্গে আছে—আর এক মিনিট দেরী নয়, বেরিয়ে পড় !"

লম্বাগিজাং কি বলিতে যাইতেছিল—বাধা দিয়া পটলী

বলিয়া উঠিল—"নগদ ১০০৲ টাকা দোবো—আর কথা কোয়ো না—ভোরের ট্রেণ ধরতেই হবে।"

*　　　*

*

দুইটি প্রাণী নির্জ্জন অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল। কয়েক পা চলিয়াই লম্বাগিজ্জাং সহসা বলিয়া উঠিল—"ওকি! তুই অমন করে হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লি কেন পটুলী—আমার বড্ড ভয় কর্‌ছে মাইরি!"—সে কথার কোন উত্তর আসিল না। মাথার উপরকার লক্ষকোটি নক্ষত্র একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল।

রাখালী

১

গোকুলদাস বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, হাত চারেক দূরে একটি পোনের ষোল বছরের ছেলে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করিতেছিল। দাওয়ার সম্মুখেই খানিকটা খালি জায়গা, তাহাতে গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই; কেবল একপাশে গোয়াল-ঘরের গা ঘেঁসিয়া পাঁশগাদার ধারে একটা চামেলীর ঝাড়, গরীবের ঘরের অবিবাহিতা কন্যার মত সমস্ত অনাদর ও অবহেলার মধ্যেও আপনার যৌবনকে নীরবে পত্রপুষ্পে পরিস্ফুট করিয়াছিল। গোকুলদাসের আট বছরের মেয়ে রাখালী ফুল তুলিয়া তুলিয়া কোঁচড়ে জড় করিতেছিল, আর আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল।

হুঁকোটাকে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া, খক্‌খক করিয়া কাসিতে কাসিতে গোকুলদাস ডাকিল, "এক ঘটি জল দিয়ে যা ত রাখালী।"

ফুল তুলিতে তুলিতে রাখালী উত্তর দিল, "আমি এখন পারবো না, নীলুদাদা ত রয়েছে, তাকে বল না।"

"সে যে পরীক্ষার পড়া পড়ছে।"

"আর আমি যে ফুল তুলছি।"

"যাবি নে ত ?"

নীলুদা যাক্ না।"

গোকুলদাস এবার তাড়া দিয়া উঠিল, "তুই যাবি কিনা তাই বল্।"

রাখালী এবার আর কোন কথা বলিল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলু বলিল, "আমি এনে দেবো ?"

"না ওকেই আনতে হবে"—বলিয়া গোকুলদাস গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "যা বল্‌ছি শিগ্‌গীর।" রাখালী তবুও নড়িল না।

"আনবিনে ত ? আচ্ছা তুই কত বড় মেয়ে তাই দেখ্‌ছি।" —বলিয়া গোকুলদাস উঠিয়া দাঁড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল, এমন সময় রান্নাঘর হইতে রাখালীর মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রে, রাখালী ?"

গোকুলদাসের আর উঠা হইল না। রাখালী এতক্ষণ কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, মার গলার সাড়া পাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল—"একটু জল নিয়ে এলে নীলুদা যেন ক্ষয়ে যায়, আমি কক্ষণো যাবো না, কিছুতে যাবো না।"

রাখালীর মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হাতমুখ নাড়িয়া সুরু করিয়া দিল, "আমার মেয়েকে বকবার তুমি কে

বল ত! কেন, নীলে কি জল আনতে পারতো না, তার গতরে কি পোকা ধরেছে, না হাত দুখানা একেবারে খসে গেছে!"

গোকুলদাস চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং গিন্নীর সুরটা উদারা মুদারা হইতে ক্রমে তারার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া হুঁকাটা লইয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

রাখালীর মা এবার নীলুর উপর পড়িল। সে নানান রকম মুখভঙ্গি করিয়া বলিতে লাগিল, "নবাবপুত্তুরের মতন বসে বসে গেলবার জন্যে তোমাকে রাখা হয়নি; গতর খাটিয়ে খেতে পার, থাক, নইলে নিজের পথ দেখ,—এখানে ওসব নবাবী চলবে না।"

নীলমণি একটি কথাও বলিল না,—সে নীরবে বসিয়া রহিল; তাহার চোখ দুটা দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটাগুলা টপটপ করিয়া কোলের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

পালা সাঙ্গ করিয়া রাখালীর মা রান্নাঘরে দিকে চলিয়া গেলে রাখালী পা টিপিয়া টিপিয়া নীলমণির কাছে আসিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "আমি আর কখনও এমন কাজ করবো না নীলুদা, তুমি চুপ কর—তোমার পায়ে পড়ি।

রান্নাঘর হইতে রাখালীর মা বলিয়া উঠিল, "রাখালী!" সে কোন উত্তর দিল না। রাখালীর মা আবার ডাক দিল, "রাখালী।" খুব বিরক্তভাবে রাখালী উত্তর দিল, "কি?"

"ওখান থেকে এখুনি চলে আয় বলছি।"

সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি কক্ষণো যাব না, বেশ করব এখানে থাকব, খুব করব এখানে থাকব।

২

সে আজ তের চৌদ্দ বৎসর আগেকার কথা গোকুলদাসের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যশোদা তখন বাঁচিয়া আছে। ওপাড়ার হরিশমণ্ডল আসিয়া একদিন একটি দুই বছরের কচি ছেলে গোকুলদাসের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, "তোমার ত ছেলেপুলে হল না ভাই, তা এটিকে যদি মানুষ কর।"

গোকুল বলিল, "কাদের ছেলে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই—হঠাৎ—"

বাধা দিয়া হরিশ বলিল, "সে সব না জেনে কি আর আমি এনেছি গোকুলদা? ও আমাদেরি স্বজাত এমন কি ওর মার সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতে পর্য্যন্ত আছে।"

যশোদা ছিল বন্ধ্যা—সেও খুব ঝুঁকিয়া পড়িল, কাজেই ছেলেটিকে গোকুলদাস বাড়ীতেই রাখিয়াছিল।

হরিশ চলিয়া যাইতেছিল, পিছু ডাকিয়া গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "ওর বাপ-মারা পরে গোলমাল করবে না ত?"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কেন না ওর বাপ মা কেউই বেঁচে নেই—"

হরিশমণ্ডল চলিয়া যাইতে গোকুল ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "আহা, অনাথ ছেলে!"

তারপর যশোদার নীলমণি, "যশোদার নীলমণি"র মত হইয়াই আদরে আদরে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সে সুখ অনাথ-বালকের কপালে বেশী দিন সহিল না। নীলমণি যখন পাঁচ বছরের, সেই সময় হঠাৎ একদিন তিনদিনের জ্বরে যশোদার মৃত্যু হইল। তাহার একবৎসর পরে যশোদার এক মাসতুতো বোনকে গোকুলদাস হঠাৎ একদিন বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়া তোলে এবং আরও দুই বৎসর পরে রাখালীর জন্ম হয়; ইহাই নীলমণির ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

গোকুলদাস সেদিন সকালে উঠিয়া হাটের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় পথে ননী মাষ্টারের সঙ্গে দেখা। গোকুলদাস পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিতেই সে বলিল, "ওহে গোকুল, ক'দিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলব বলব মনে করছি—তা আর হয়ে উঠেনি।"

হাত যোড় করিয়া গোকুল বলিল, "আজ্ঞে করুন মাষ্টার মশাই।"

"বলছিলাম কি, পরীক্ষার পর নীলমণিকে এখানে আর না রেখে, কল্‌কাতায় কলেজে পড়ার জন্যে পাঠালে আমার মনে হয় খুব ভাল হয়। ওর পড়াশুনোর ধার যে রকম, তাতে মনে হয় ও পরে একটা মানুষ হবে।"

"অত পয়সা কোথা থেকে—"

কথাটা সমাপ্ত হইতে না দিয়া ননী মাষ্টার বলিল, "সেও একটা কথা বটে।" তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, জমিদার বাবুকে বলে' কিছু করতে পারি কি না দেখি।"

গোকুলদাস সেদিন আর হাটে গেল না, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে ডাকিল, "নীলু!"

পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া নীলমণি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাখালী অদূরে একটা বিড়াল ছানার ল্যাজের সঙ্গে একটু রসিকতা করিতেছিল; সেও ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। গোকুল বলিল, "তুই খেলা করগে যা না রাখালী।"

সে বলিল, "না যাব না।"

আজ কয় দিন হইতে রাখালী এই একটা জিনিষ ক্রমাগত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে, তার বাপ যখন তখন চুপি-চুপি নীলমণির সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা কহেন। এটা তার মোটেই ভাল লাগিত না এবং ইহাতে কেমন একটা ভয়ও তাহার হইত।

গোকুলদাস আবার বলিল, "যা না রাখালী।"

"আমি থাকি না বাবা।"—কথাটা রাখালী এমন কাতরভাবে বলিল যে, গোকুলদাস আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। সে মনে মনে ভাবিল, সেই ত একদিন শুনবেই, তার চেয়ে আগে থাকতেই শুনে রাখুক। তার পর গোকুলদাস ননী

মাষ্টার যে সব কথা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার কাছে বলিয়াছিল, সে সমুদয়ই নীলমণিকে বলিল। নীলমণি চুপ করিয়া রহিল।

গোকুলদাস বলিল, "কি করবি বল্।"

নীলমণি মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"এখনও সময় আছে, পরীক্ষাটার কি ফল হয় দেখা যাক্। তারপর—"

রাখালী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ ভাঙ্গা গলায় কাঁপা স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কক্ষণো ঝগড়া করবো না, নীলু দা, তুমি কোথাও যেও না, তোমার পায়ে পড়ি।"

গোকুল রাখালীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল—নীলমণির চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল।

৩

তার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রাখালীর মার মৃত্যু হইয়াছে, গোকুলদাসও আর ইহজগতে নাই। নীলমণি এখন কলিকাতায় চাক্‌রী করিতেছে।

সেদিন রবিবার। বেলা তখন প্রায় বারোটা হইবে। জানালা দিয়া শীতকালের মিহি রৌদ্র তখন ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। নীলমণি সেইখানটিতে বসিয়া একখানা খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছিল। এমন সময় রাখালী আসিয়া ডাকিল, "ভাত যে জুড়িয়ে গেল।"

"এই যাই,—" বলিয়া খবরের কাগজের উপর হইতে চোখ দুইটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি রাখালীর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এবং খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তাই ত, তুই যে খুব বড় হয়েছিস, রাখালী।

একটু হাসিয়া রাখালী উত্তর দিল, "চিরকালই বুঝি কচি খুকীটি থাকব?"

"তোর বয়স কত হল?"

হিসাব করিয়া রাখালী বলিল, "এই ফাগুনে পনেরয় পড়বো।"

"বলিল, কিরে! নাঃ—আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলে না দেখছি, একটা ঘটক টটকও যে পাই নে।"

"কেন, ঘটক কি করবে?" বলিয়া বিরক্তভাবে রাখালী নীলমণির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

"কি করবে? বল কি!—পাত্রের সন্ধান করবে।"

"কেন আমার ত—" কথাটাকে শেষ না করিয়াই রাখালী বলিল, "ভাত জুড়িয়ে গেল যে!"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া নীলমণি দরজার দিকে চাহিয়া দেখে রাখালী সেখানে নাই—সে কখন চলিয়া গিয়াছে।

ভাত খাইতে বসিয়া নীলমণি দেখিল, রাখালী প্রতিদিনকার মত সেখানে বসিয়া নাই। বুড়ো ঝি কলের ধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, নীলমণি বলিল, "রাখালী কোথায় গেল জান, ঝি?"

সে বলিল, "দিদিমণি ত ঘরে শুয়ে আছেন।"

"এমন অবেলায়?"

"মাথাটা নাকি বড্ড ধরেছে।"

ভাত খাইয়া উঠিয়া নিজের ঘরে আসিয়া নীলমণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাখালী তাহার উপর রাগ করিয়াছে এবং সে রাগের কারণটা যে কি তাহা বুঝিতে নীলমণির বেশী দেরি হইল না।

মরিবার সময় গোকুলদাস নীলমণিকে বলিয়া যায়; সে যেন রাখালীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হয়; রাখালীকে অন্য হাতে দিবার কথা পাড়িয়া সে যে আজ খুবই অন্যায় করিয়াছে, সেটা সে নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে যে বিবাহই করিবে না ঠিক করিয়াছে। যদি সে রাখালীকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিত, তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সে ত আর তা করিতেছে না!

রাখালীর শুইবার ঘরে ঢুকিয়া নীলমণি ডাকিল, "রাখালী!"

রাখালী দেওয়ালের দিখে মুখ ফিরিয়া শুইয়াছিল। সে কোন উত্তর দিল না।

নীলমণি আবার ডাকিল, "রাখালী।"

সেইভাবে থাকিয়া সে উত্তর দিল, "কি?"

"তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"

সে বিরক্তভাবে উত্তর দিল, "যাও মিছে বিরক্ত করতে এস না—আমার বড় মাথা ধরেছে—ঘুমোতে দাও।"

নীলমণি আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

পরদিন নীলমণির ভাত খাইবার সময় রাখালী আসিল না; আফিস যাইবার সময় নীলমণি অনেক সাধ্যসাধনা করিল, সে কিন্তু উঠিল না—এবং কেন যে রাগ করিয়াছে তাহাও বলিল না।

আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া নীলমণি রাখালীর ঘরে ঢুকিয়া দেখে রাখালী সেখানে নাই; ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বুড়ো ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাখালী, কোথায় জান, ঝি?"

"দিদিমণি ত এখানে নেই।"

"সে কি!"

"কেন, তিনি ত আজ তিনটের গাড়ীতে দেশে চলে গেছেন।"

"দেশে?—মহেশপুরে?—কার সঙ্গে?

"রামহরির সঙ্গে।"

নিজের ঘরে আসিয়া, জামা কাপড় না ছাড়িয়াই নীলমণি তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল।

৪

গোকুলদাস ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর নীলমণি সেই যে রাখালীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল, তার পর আর দেশে ফিরিয়া যায় নাই। সেই হইতেই রাখালীর দূর-সম্পর্কীয়া এক মাসী তার বিধবা কন্যাকে লইয়া গোকুলদাসের ভদ্রাসনখানিতে বাস করিয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরি নাই। রাখালীর মাসী তুলসী তলায় বসিয়া মালা ফিরাইতেছিল, এমন সময় অন্ধকারে রাখালী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া রাখালীর মাসী বলিল, "কে গা বাছা তুমি?"

"আমি রাখালী—" বলিয়া রাখালী সেইখানে বসিয়া পড়িল।

"রাখালী? বলা কওয়া নেই হঠাৎ যে—নীলমণি ভাল আছে ত?"

"এই তোমাদের দেখতে এলাম।"

"তবু ভাল, মাসীকে যে ভুলেও মনে পড়েছে, এই না

আমাদের ভাগ্যি।"—কথাটাকে শেষ করিয়াই মাসীর চীৎকার উঠিল, "ওরে বিন্দি, কে এসেছে দেখে যা!"

বিন্দু রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই মাসী বলিল, "কে, বল্ দেখি?"

সে বলিল, "কে ত চিনতে পারছি নে।"

"চিনতে পারছিস নে? ওযে আমাদের রাখালী! আহা; ফুলী যদি আজ—" মাসী কাপড়ের খুঁটটা শুকনো চোখের উপর বারবার ঘষিতে সুরু করিয়া দিল।

"আমি তোমাকে সেই একরত্তিটি দেখেছিলাম, তার পর ত আর দেখিনি।"—বলিয়া বিন্দু রাখালীর কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল।

মাসী আবার আরম্ভ করিল, "আহা, ফুলু আমাকে কত ভালই বাসতো—মার পেটের বোনও এত করে না।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "এমন মানুষও যায় গা! তাও কি বুড়ো হাবড়া হয়েছিল? সবই ভগবানের খেলা! তা না হলে—"কথাটাকে শেষ না করিয়াই সে বলিল, "তা তুই কার সঙ্গে এলি? তোর নীলুদা সঙ্গে করে এনেছে বুঝি?"

"না, আমি রামহরি দাদার সঙ্গে এসেছি।" কথাটা রাখালী এতই নীরস ভাবে বলিল যে, অন্য কেহ হইলে তার পর আর সে সম্বন্ধে কোন কথা তুলিত না। মাসী কিন্তু তবু বলিল, "কেন সে কি নিজে আসতে পারতো না? এতই কাজের লোক হয়েছে সে?"

রাখালী কোনও উত্তর দিল না, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মাসী আবার আরম্ভ করিল, "একেই বলে নেমখহারাম রে, একেই বলে নেমখহারাম। যার খেয়ে মানুষ—"

কথাটা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না দিয়া বিন্দু বলিল, "তোমার সে কথায় কাজ কি মা? জান না শোন না, ফস্ ক'রে একজনের নামে যা-তা বলাটা ঠিক নয়।

সে তখন রাখালীর একটা হাত ধরিয়া বলিল, "এস বোন আমার সঙ্গে এস।"

৫

বিন্দুবাসিনীর জীবনটা নিতান্তই একঘেয়ে ধরণের ছিল। তার যখন আট বছর বয়স সেই সময় এক পঞ্চাশ বছরের বুড়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় এবং দশ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার নামে এক মিথ্যা কলঙ্ক রটে। সেই হইতে সে এমনি কঠোর ভাবে নিজেকে বাড়ীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সুরু করিয়াছিল যে, পাড়ার কেহই জানিতে পারিত না সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে। তার পর ক্রমে সে পঁচিশে পা দিয়াছে, কিন্তু এখনও সে ঠিক তেমনই আছে—একও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তার মা ছিল কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। সে সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিত। মুখটা কিন্তু তার ভারি মিষ্ট ছিল।

রান্নাঘরে গিয়া প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে রাখালীর মুখের দিকে চাহিয়া বিন্দু চমকিয়া গেল,—তার চোখ দুইটা একেবারে জবাফুলের মত লাল হইয়া রহিয়াছে।

একটা পিঁড়ি সরাইয়া দিয়া বিন্দু বলিল, "বোস বোন।"

অনেকক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল, কাহারও মুখে কথা নাই; কিছুক্ষণ পরে বিন্দু বলিল, "এখানে ক'দিন থাকবে তুমি?"

অন্যমনস্কভাবে রাখালী উত্তর দিল, "ঠিক বলতে পারি নে।" বিন্দু চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া রাখালী আপনার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দেওয়ালের কুলুঙ্গীর উপর একরাশ ছেঁড়া বই খাতা জড়ো করা ছিল, সে সেইগুলিকে নামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিল। এসব নীলমণির ছেলেবেলাকার বই। রাখালী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেগুলিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তার পর হঠাৎ কি মনে করিয়া সেগুলিকে একজায়গায় জড়ো করিয়া ঘরের জানালা দিয়া পাশের পোড়ো জমিতে ফেলিয়া দিল এবং আস্তে আস্তে মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিকালে বিন্দু আসিয়া দরজায় ঘা দিতে রাখালী দরজা খুলিয়া দিল; বিন্দু বলিল, "আয় চুলটা বেঁধে দিই।"

"না, আজ আর চুল বাঁধবো না।" বলিয়া রাখালী ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু তাহার হাতটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা না হয় চুল নাই বাঁধলি, তা বলে' ঘরের ভিতর আসতে ত কোন দোষ নাই।" বলিয়া সে রাখালীকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল।

"আমি তোর দিদি হই, আমার কাছে কোন কথা লুকোস নে—তোর কি হয়েছে বল।"

রাখালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"বলবি নে" বলিয়া বিন্দু রাখালীর মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। রাখালী ছোট মেয়ের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কেন কে জানে, রাখালীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত বিন্দু তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তাহার একঘেয়ে জীবনটার মাঝখানে হঠাৎ সে যেন একটা বৈচিত্র্যের সুখস্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেটা কোন্ দিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় সে মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠে।

পরদিন প্রাতঃকালে বিন্দু এবং রাখালী রান্নাঘরে কুটনা কুটিতেছিল, এমন সময় বিন্দুর-মা আসিয়া সেইখানে বসিল এবং হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তা হ্যাঁরে রাখালী, তুই কি মনে করেছিস্ চিরকাল এইভাবেই থাকবি, বিয়ে-থা বুঝি আর করতে হবে না? আচ্ছা পাগলী মেয়ে ত!"

বিন্দু বলিল, "সে ও নিজে বুঝবে মা।"

"ঐ ত হয়েছে একালের মেয়েদের দোষ। নিজেরাই হয়েছেন সব কর্ত্তা, গুরুজনদের কথা তো আর শুনবেন না; তা যাক্ এখন একটা কথা শোন্ দিকি বিন্দি, ও পাড়ার রমেশকে চিনিস ত?"

"কে রমেশ, সেই ঘাড়ছাঁটা ফচ্‌কে ছোঁড়াটা ?"

"তোর যেমন কথার ছিরি!" বিন্দুর-মা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "তা আসল কথাটা কি তাই খুলে বল না।"

"বলছিলাম কি, ছোঁড়ার বিষয় আশয় বেশ আছে—বলিয়া বিন্দুর-মা কটাক্ষে একবার রাখালীর মুখের পানে চাহিয়া লইল। তার পর আবার আরম্ভ করিল, "দেখতে শুনতেও বেশ, আর তা ছাড়া—"

বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি মা ?"

"না, আমাদের আর কি! তবে বলছিলাম কি রাখালীর সঙ্গে তার—"

"চুপ কর মা—ও কথা তুমি আর কখনো মুখে এনো না বলছি। তোমার কি একটু আক্কেলও নেই!"

বিন্দুর-মা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কেন বলত, ও বুড়ো হাতী মেয়েকে সে যে নিজে থেকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, এই না ওর ভাগ্যি! পাড়ার লোকে কি বলে জানিস ?—বলে ও মেয়ে—"

গলার স্বরটাকে যতদূর সম্ভব কড়া করিয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "পাড়ার লোকের কথা শোনবার জন্যে আমরা বসে নেই মা। অন্য কথা থাকে ত বল, আর নইলে এখান থেকে উঠে যাও।"

স্বরটাকে একটু নামাইয়া লইয়া বিন্দুর-মা আবার আরম্ভ

করিল, "আহা, পাড়ার লোকে বলে বলেই কি আর আমরা তাই বিশ্বাস করছি? না আমরা রাখালীকে চিনিনে? সতী-সাধ্বীর মেয়ে ও, ওর নামে কুচ্ছো যারা রটাবে তাদের জিভ্ খসে পড়বে; তবে কি না বলছিলাম, রমেশ ছেলেটি—"

"রমেশের নাম তুমি মুখে এনো না মা—সে হাড়হাবাতে ছোঁড়া।

"তোর ঐ কেমন এক কথা বিন্দি—সে হাড়হাবাতে কিনা তুই কি করে জানলি?"

"সে আমি খুব জানি মা—হাড়ে হাড়ে জানি। সে দিন সন্ধ্যের সময় ঘাট থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, সে আমাকে শুনিয়ে এমন সব কথা বলতে লাগলো, ছি ছি ছি!" বলিয়া বিন্দু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

"ওটা কিছু নয়, বয়সের সময় অমন দোষ পুরুষ মানুষের একটু না আধটু থাকেই। অত কথায় কাজ কি, তোর বাপেরও—"

"তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি এখান থেকে উঠে যাও।" বলিয়া বিন্দু নিজেই ঘর হইতে চলিয়া গেল।

৬

আফিস হইতে ফিরিয়া নীলমণি নিজের ঘরের জানালার ধারে চুপটি করিয়া বসিয়াছিল ; কিছুই ভাল লাগিতেছিল না ; আজ প্রায় দুই সপ্তাহ হইতে চলিল রাখালী চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু ইহার মধ্যে সে তাহাকে একখানিও পত্র দেয় নাই এবং সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, আগে সে কখনই পত্র লিখিবে না। আজ কিন্তু তাহার মনটা হঠাৎ কেমন হইয়া গিয়াছে।

সম্মুখের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিরিবিলিতে পুতুল খেলিতেছিল। নীলমণি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তার পর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাগজ কলম লইয়া রাখালীকে পত্র লিখিতে বসিল। সে লিখিল, "তুমি চলে' এস, আমার উপর রাগ করে থাকতে আছে ?"

লিখিতে লিখিতে নীলমণির চোখ দুইটা জলে একেবারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল ; ছেলেবেলেকার সেই অভিমানিনী রাখালীর মুখখানি আজ তার মনের মধ্যে বারবার জাগিয়া উঠিতেছিল।

সম্মুখের বাড়ীর সেই ছেলেটি আর মেয়েটি তখন পর্য্যন্ত খেলা করিতেছিল। নীলমণির মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাহাদের দুইজনকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে।

নীলমণি যে বিবাহ করিবে না স্থির করিয়াছিল, রাখালীই ছিল তার মূল কারণ। গোকুলদাসের কথা যে তাহার মনে ছিল না তাহা নয়; কিন্তু রাখালীকে স্ত্রীভাবে দেখিতে তাহার মন কোন দিন রাজী হয় নাই। তাহার বুকের মাঝখানে স্ত্রীর জন্য যে অংশটুকু যৌবন নিজের হাতে খালি করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে সে রাখালীকে তার ত্রিসীমানার মধ্যে এক দিনের তরেও আনিতে পারে নাই। কাজেই সে ঠিক করিয়াছিল জীবনে কখনও সে বিবাহ করিবে না; এবং কোন একটি সুপাত্র দেখিয়া তারই হাতে রাখালীকে দিয়া সে নিজে নিশ্চিন্ত হইবে, এমনিটাই সে বরাবর মনে করিয়া আসিয়াছিল। সেদিনকার সেই ঘটনাতে সে কিন্তু রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। রাখালী যে চুপে চুপে ভিতরে ভিতরে তাহাকে স্বামীর আসনে নিশ্চিন্তভাবে বসাইয়া দিয়াছে, এমন একটুও আভাস ত সে তার ব্যবহারের মধ্যে বা কথাবার্ত্তার মধ্যে পূর্ব্বে একদিনের তরেও টের পায় নাই।

নীলমণি চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল এখন তার কি করা কর্ত্তব্য।

৭

পুকুরঘাট হইতে স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া রাখালী দেখে, তার নামের একখানা চিঠি দাওয়ার উপর পড়িয়া রহিয়াছে ; সে সেখানা তুলিয়া লইয়া ঘরের ভিতর গিয়া খিল আঁটিয়া দিল। তারপর সে যখন ঘর হইতে বাহিরে আসিল, তখন তার চোখ দুটো একবারে জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বরাবর ভাঁড়ার ঘরে গিয়া একটা বঁটি লইয়া আলু ছাড়াইতে বসিয়া গেল।

রান্নাঘর হইতে বিন্দু ডাকিল, "রাখালী।" চাপা গলায় সে উত্তর দিল, "কি !"

"ওখানে একলাটি না বসে, আমার কাছে এসে কুটনো কোট না বোন।"

রাখালী বঁটি এবং আলুর চুবড়ি লইয়া রান্নাঘরে গিয়া বসিল।

রাখালীর মুখের দিকে চাহিয়া বিন্দু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল একটা কিছু হইয়াছে। তাহার নামে যে একটা চিঠি আসিয়াছে সে খবরও বিন্দু জানিত এবং তার চোখ দুটা হঠাৎ রাঙ্গা

হইয়া উঠিবার কারণও যে ঐ চিঠিরই মধ্যেই আছে, একথাও সে খুব ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথাই সে তুলিল না।

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে দাওয়ায় বসিয়া রাখালী বিন্দুর একখানা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিল; এমন সময় হঠাৎ কার জুতার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সম্মুখে একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

যে লোকটি তাদের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দরজার আড়াল হইতে তার চেহারাখানা দেখিয়া সেই দুঃখের সময়ও রাখালীর হাসি পাইতে লাগিল। লোকটির বয়স বেশি নয়—ত্রিশের ভিতর; রংটা মেটে মেটে, মাথার সমুখ দিকে লম্বা লম্বা চুলগুলো চোখ অবধি আসিয়া পড়িয়াছে, পিছন দিক কিন্তু একবারে খুর দিয়া কামানো। গায়ে কালো রঙের একটা পাঞ্জাবী—স্ত্রীলোকের সেমিজের মত হাঁটু ছাড়াইয়াও আধহাতটাক ঝুলিয়া রহিয়াছে। পায়ে বার্ণিস করা অয়েলক্লথের একজোড়া পম্‌সু, তাতে আবার সোনালী রঙের বগলস আঁটা; হাতে একগাছা মহিষের শিঙের ছড়ি, তার ধরিবার জায়গাটাতে একগাছা বেলফুলের মালা জড়ানো। লোকটি এদিক ওদিক চাহিয়া ডাক দিয়া বলিল, "মাসী আছ?"

"এই যাই গো" বলিয়া রান্নাঘর হইতে মাসী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "কি খবর বাবা?"

"কাল বারোয়ারী তলায় যাত্রা হবে—বিদ্যেস্থন্দরের পালা। আমি স্থন্দর সাজছি—দেখতে যেও মাসী।"

"যাবো বৈ কি বাবা।"

"যাবো বৈকি নয়, নিশ্চয় যাওয়া চাই—আর মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে যেও।"

লোকটা চলিয়া যাইতে বিন্দুর মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখে বিন্দু মুখখানা হাঁড়ির মত ভারি করিয়া একটা পিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। সে ঘরে ঢুকিতেই বিন্দু খুব কঠোর ও দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "রমেশ, কার হুকুমে আমাদের বাড়ীর ভিতর অমন করে বলা কওয়া নেই ঢোকে মা?"

"ও যে আমাদের আপনার জন রে"—বলিয়া বিন্দুর মা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু বাধা দিয়া বলিল, "একটা কথা শুনে যাও মা।"

"কি বল্ না।"

"ও যদি ফের আমাদের বাড়ীর ভিতর অমন করে ঢোকে ত আমি তা সহ্য করবো না বলছি।"

"আচ্ছা তাই হবে লো।" বলিয়া সে আবার পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, বিন্দু আবার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা লো, নয় মা; বিন্দু বেশি কথা বলে না, কিন্তু সে যে কথা একবার মুখ দিয়ে খসায়, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন হয়ে থাকে এটা যেন মনে থাকে।"

৮

নীলমণির চিঠির জবাবে রাখালী যাহা লিখিয়াছিল, তাহা পড়িয়া নীলমণি স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে লিখিয়াছে, আর যেন সে তাহাকে পত্র না লেখে এবং ভবিষ্যতে সে যেন তার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কের দাবি না করে। পত্রখানা পড়িয়া নীলমণি এবার সত্যসত্যই বড় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া আবার পত্র লিখিতে বসিল। রাখালী কিন্তু তার কোন জবাবই দিল না। নীলমণি আবার একখানা পত্র লিখিল। সে লিখিল—"এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এ রকম করে রাগ করে থাকা কি উচিত,—লক্ষ্মিটি ফিরে এস।" এবারও রাখালী কোন জবাব দিল না।

নীলমণির শেষ পত্রখানা যখন রাখালীর হাতে পড়িল, সে তখন খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘরের ভিতর মাদুরের উপর পড়িয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। বিন্দু আসিয়া তাহার হাতে চিঠিখানা দিয়া চলিয়া গেল। চিঠিখানা সে তিন চারি বার করিয়া পড়িয়া শেষ করিল। শেষ কালে কি ভাবিয়া, দোয়াত

কলম এবং কাগজ লইয়া লিখিতে বসিল। তুই চারি ছত্র লিখিয়াই সে কি ভাবিয়া কাগজখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল এবং দোয়াত ও কলমটা কুলুঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিয়া, আবার মাতুরের উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল।

রাখালী মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, নীলমণি নিশ্চয়ই তাহাকে স্ত্রীর আসনে বসাইবার উপযুক্ত মনে করে নাই এবং সেই জন্যই অন্যলোকের স্কন্ধে তাহাকে চাপাইয়া দিয়া সে নিজে রেহাই পাইতে চায়। আজ অবশ্য সে ক্ষমা চাহিতেছে, কিন্তু তিরস্কারের ভয়ে ত আর মানুষের ভিতরটা কিছু বদলাইয়া যায় না। আজ যে নীলমণি তাহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য এত অনুনয় বিনয় করিতেছে, ইহার মধ্যে আছে শুধু কর্ত্তব্যের শুষ্ক তাগিদ, প্রাণেরও নয়—বুকেরও নয়। সে একদিন তাহার বাপের কাছে অনেক উপকার পাইয়াছে, ইহারই জন্য মানুষ মানুষকে যেটুকু খাতির করিয়া চলে, তার চেয়ে এক চুলও বেশী দরদ ত ইহার মধ্যে নাই! নীলমণি লিখিয়াছে, "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত দিন ধরে' রাগ করে থাকাটা কি উচিত?" নীলমণি যে এই ঘটনাটাকে এত সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিয়াছে, ইহার অস্বস্তিটাই রাখালীর বুকের ভিতর বিষফোড়ার মত টন্ টন্ করিয়া উঠিতে লাগিল।

৯

এই ঘটনার চারি পাঁচ দিন পরে একদিন সকালে পুকুর হইতে স্নান করিয়া রাখালী ভিজাকাপড়ে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় পথের মাঝখানে রমেশ তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কতকগুলি রসিকতা করিতে লাগিল। সে বাড়ী ফিরিয়া জল-স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না, এবং ইহার জন্য সে নীলমণিকেই শত সহস্রবার করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিল।

সেই দিনই বিকালের দিকে বিন্দু ও রাখালী দাওয়ায় বসিয়া তেঁতুল ছাড়াইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "রাখালী"।

বিন্দুর মা গোয়াল ঘরে দুধ দুহিতেছিল, বাহিরে আসিয়া সাড়া দিল—"কে গা?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল—"আমি নীলমণি"।

"কে আমাদের নীলু?—তা বাহিরে কেন বাবা, ভিতরে এস"—বলিয়া বিন্দুর মা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

বিন্দুর মাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, "রাখালী কোথায় মাসী?"

"সে ত এইমাত্র এইখানেই ছিল"—বলিয়া স্বর টানিয়া বিন্দুর মা হাঁকিয়া উঠিল, "ওলো অ—রাখালী, তোর নীলুদা এসেছে যে—বেরিয়ে আয় না লো।"

ভিতর হইতে কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বিন্দুর মা তখন ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সে দেখা করতে চাইছে না বাপু, আমি কি করবো বল।"

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি বলিল, "তাকে বলুন একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে।"—তার পর কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "না থাক্‌গে কাজ নেই"।

নীলমণি চলিয়া যাইতে বিন্দু বলিল, "এটা কিন্তু তোর খুবই অন্যায় হয়েছে রাখালী।"

রাখালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিন্দু আরও কি বলিতে যাইতেছিল, চাপা গলায় রাখালী বলিল, "আমাকে কোন কথা বোলো না দিদি; দোহাই তোমাদের।"

১৩

তার পর আর ও একমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ ক'দিন নীলমণির শরীরটা বড় ভাল যাইতেছিল না। প্রত্যহ রাত্রে তার একটু একটু ঘুষঘুষে জ্বর হইতেছিল। সেদিন রবিবার, আফিস বন্ধ—সে খাওয়া দাওয়া সারিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একটা পোষ্টকার্ড তার হাতে দিয়া গেল। পোষ্টকার্ড আসিতেছে মহেশপুর হইতে, লিখিয়াছেন হরিশ ভট্টাচার্য্য। নীলমণি পত্রখানা এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল—"পত্রপাঠ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিবে, বিশেষ দরকার আছে।"—বাস এইটুকু পত্র। নীলমণি দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। হরিশ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তার কি এমন দরকার থাকিতে পারে?—তবে কি রাখালীর কোন—নীলমণির মাথাটা ঘুরিতে লাগিল; ছেলেবেলাকার সেই দুরন্ত রাখালী তার চোখের সম্মুখে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

* * *

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিন্দুর মা সদর দরজার কাছে

দাঁড়াইয়া প্রাচীরের গা হইতে শুষ্ক ঘুঁটেগুলাকে খসাইয়া খসাইয়া একটা চুবড়ির মধ্যে জড় করিতেছিল, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে নীলমণি আসিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর সব খবর ভালো ত মাসী ?"

তিন চার হাত তফাতে সরিয়া গিয়া বিন্দুর মা বলিল, "তুমি বাপু আমাদের এখানে আর এস না, একদফা ত জাতজন্ম সব খেয়েছ—তার উপর—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিন্দু কোথা হইতে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি চুপ কর মা, তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না।"

তার সে সময়কার চেহারা দেখিয়া বিন্দুর মা চমকিয়া উঠিল ; তার এই লাজুক মেয়েটি, যে নাকি কখন অন্য পুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখিত না, সে আজ হঠাৎ এমন নির্লজ্জ ভাবে একজন অপরিচিত যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে কথা কহিতে পারে এটা তার কাছে আজ ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল।

তার মার দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া বিন্দু বলিল, "রাখালী ভাল আছে নীলমণি, তুমি তাকে মাফ্ কর।" তার স্বর কম্পিত এবং খুব গাঢ়।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি বলিল, "আমি তবে এখন আসি।"

"না যেতে পারবে না, কক্ষণো না,—তা হলে রাখালী আপশোষে মরে যাবে।"

"কেন, তার কি কোন—"

বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "না না অসুখ করেনি—সে বেশ ভালই-আছে—তবু তুমি যেতে পারবে না।"

নীলমণি কিছুই বুঝিতে পারিল না—সে হতভম্বের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—চারিদিক নিস্তব্ধ—কাহারও মুখে কথা নাই—তিনজনেই নিস্তব্ধ। হরিশ ভট্চাজ সহসা পিছন দিক হইতে আসিয়া খুব কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম—মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার জন্যে নয়!"

নীলমণি কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "সে জন্যে অন্য কাউকে মাথা ঘামাতে আমরা ডাকি নি—আপনি এখান থেকে চলে যান্।"

হরিশ ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া গেল—সে আজ সত্য সত্যই ভয় পাইল। মেয়েমানুষের গলার আওয়াজে যে এতটা তেজ থাকিতে পারে, ভট্টাচার্য্য তা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে তবু চেঁচাইয়া উঠিল, "একটা জারজের সঙ্গে গেরস্ত ঘরের মেয়েরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কথা কয়, এটা খুব ইজ্জতের কথা, নয়! তাই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করা হচ্ছে!"

বিন্দুর মা এই সময় কি বলিতে যাইতেছিল, বিন্দু দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তুমি চুপ কর মা।" সে তবু কি বলতে যাইতে-ছিল; বিন্দু চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার হুকুম তুমি চুপ কর।" তার পর খুব গম্ভীর এবং দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "পারেন ত এক-

ঘরে করে দিন গে, যান হরিশকাকা, এর বেশী ত আর কিছু করতে পারেন না।"

নীলমণি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে এইবার বলিল, "কি হয়েছে তাই খুলে বলুন না কেন মশাই।"

হরিশ ভট্টাচার্য্য কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "কাউকে কোন কথা বলতে হবে না, আমি নিজেই সব বলছি।" তার পর গলাটাকে আরও গম্ভীর এবং আরও দৃঢ় করিয়া লইয়া সে বলিতে লাগিল, "তবে শোন নীলমণি। ক্ষেমী বোষ্টুমীকে মনে পড়ে? সেই ছিল তোমার মা। এতদিন এ কথা কেউ জানত না—সেদিন মরবার সময় সে সব কথা ব'লে ফেলেছে। এ কথা এ গ্রামের সকলেই বিশ্বাস করেছে।" এই অবধি বলিয়াই বিন্দু ডাকিল—"রাখালী।"

নীলমণি রাস্তার উপর বসিয়া পড়িল। ঝড়ের মত রাখালী আসিয়া তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমাকে মাপ কর নীলুদা—এমন কাজ আর কক্ষণো করবো না; আমায় তোমার কাছে কলকাতায় নিয়ে চল! তুমি অমন করে বসে থেকো না নীলুদা, তোমার পায়ে পড়ি।"

তরুণী ভার্য্যা

১

গাঙ্গুলীদের সংসারটি ছিল একটি আস্ত চিড়িয়াখানা। তার মধ্যে নানান রকমের জীব বাস করিত এবং কারুর সঙ্গে কারুর মিল বড় একটা দেখা যেত না।

বড় হরিচরণ, সে ছিল পাকা জমীদার; বিষয়-বুদ্ধিতে সে তার পূর্ব্বপুরুষদেরও টেক্কা দিয়ে উঠেছিল, এবং জমিদারী বাড়াবার জন্য সে করেনি হেন কাজ নেই, যদিও তার ছেলেপুলে হয়নি এবং তার নিজের সম্বন্ধে খরচপত্র আদবেই ছিল না। পর্‌ত সে মোটা কাপড়, মোটা জামা এবং বিলাসিতা তার আদবেই ছিল না। তারপর, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তার চেয়ে গরীব তার প্রজাদের মধ্যে একটিও ছিল না, কেননা, খেত সে পোরের ভাত, মাগুর মাছের ঝোল আর পাতি-লেবু,—তাতেও মাঝে মাঝে চোঁয়া ঢেকুর উঠত, অম্বল হ'ত, এবং কবরেজ মশায়ের ডাক পড়ত।

বয়স তার হয়েছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি। সে ছিল কর্ত্তার

প্রথম পক্ষের সন্তান। আর যে দুটি ভাই তার ছিল, তারা ছিল কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। বাপের জ্যেষ্ঠপুত্র বলেই হোক বা যে কারণেই হোক সেও দুটি বিবাহ করেছিল, অবশ্য একটির অবর্ত্তমানে—কিন্তু ষষ্ঠীঠাকরুণের কৃপণতা তবুও ঘোচেনি।

মেজ তারিণীচরণ, সে ছিল একটি নিরেট মাথামোটা লোক এবং তার দেহটা ছিল তার চেয়েও নিরেট এবং তার চেয়েও মোটা। সে কুস্তি লড়ত, মাটি মাখত, শনি-মঙ্গলবার হ'লে হনুমানজীর সুমুখে সিন্নী চড়াতো এবং লুঙ্গি এঁটে, গায়ে বুটিদার পাঞ্জাবী উড়িয়ে, মোটা একগাছা পাকা গদ্‌কা লাঠিহাতে ক'রে গদাইলস্করী চালে গ্রামময় ঘুরে বেড়াত; গ্রামের লোকে ভয় করত কিন্তু ঐ লিক্‌লিকে পাতলা অজীর্ণরোগী হরিচরণকেই বেশি বেশি। তারিণীচরণের সব চেয়ে বন্ধু ছিল কালুডোমের ব্যাটা মুরারি। বিশ্বদুনিয়াটার মধ্যে সে এই একটিমাত্র জীবকে পেয়েছিল যার সঙ্গে তার মনের প্রাণের কথা হতে পারে। মুরারির চেহারাটি ছিল লোহার ভাঁটাটির মত,—ঠিক তেমনি নিরেট এবং ঠিক তেমনি কালো।

ছোট শ্যামাচরণ তিন বার এণ্ট্রান্স ফেল ক'রে গত বৎসরে হঠাৎ পা পিছলে পাশ হয়ে গিয়েছিল এবং কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করছিল। সে নাকিসুরে গান গাইত, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলত এবং প্রতিদিন বৈকালে বিডনস্কোয়ারের ঘাসের উপর ব'সে উদাস দৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে থাকত।

তার পর অন্দরমহলে যে একটিমাত্র জীব বাস করত

বৈচিত্র্যের দিকে থেকে সে সকলকে ছাপিয়ে উঠেছিল। রমার বয়স হয়েছিল বড় জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। সে কিন্তু কথায় কথায় বলত তার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। তার ছেলেপুলে একটিও হয়নি এবং সেই জন্যেই সে নিঃসঙ্কোচে ব'লে বেড়াত যে, যদি তার সময়ে ছেলে হোতো তা হলে সে আজ নাতির মুখ দেখতে পেতো।

সে চওড়াপেড়ে কাপড় পরত না, হাতে দু-এক—গাছা চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা গায়ে রাখত না এবং চুল বাঁধবার সময় সুমুখের চুলগুলোকে এমন অসম্ভব রকমে পিছনের দিকে টেনে তুলে দিত যে হঠাৎ দেখলে মনে হোতো, তার সামনের চুলে টাক ধরেছে, যদিও তার মাথায় চুল ছিল যথেষ্ট ঘন এবং কোঁকড়া। এ সম্বন্ধে কেউ কিছু বল্লে সে বলত, "বয়স ত আর কিছু কম্‌ছে না—দিন দিন বাড়তেই চলেছে।"

সংসারের কোন কাজই তাকে করতে হোতো না এবং দায়িত্ব ছিল তার চাইতে কম। সে কিন্তু যখন-তখন বল্‌ত যে, তার মরবার পর্য্যন্ত ফুর্‌সত নেই এবং এমন ক'রে সে আর পারে না। এ হেন বড় বৌয়ের সব চেয়ে প্রিয়পাত্র ছিল তারিণীচরণ, কারণ সংসারের মধ্যে সেই ছিল সব চেয়ে অকর্ম্মণ্য এবং আহাম্মক। সে যখন-তখন এবং যার তার কাছে ব'লে বেড়াত যে, তার এই অকর্ম্মণ্য দেবরটিকে নিয়ে সে আর পারে না এবং এই অকর্ম্মণ্য জীবটির ছল করে তার

শ্বাশুড়ীঠাকরুণ যে মস্ত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা তার ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, একথা সে যার তার কাছেই ব'লে বেড়াত; যদিও তার বিয়ের অনেক আগেই শ্বাশুড়ীঠাকরুণ গঙ্গালাভ করেছিলেন।

মোট কথা, তার এই অকর্ম্মণ্য দেবরটির সম্বন্ধে সে নিজেকে মা'র আসনে নিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়ে দিয়েছিল, যদিও তারিণীর চেয়ে সে মাত্র দু বছরের বড় ছিল। পাড়ার লোকে কিন্তু এটাকে নেহাৎই বাড়াবাড়ি ব'লে মনে করত।

রমার বিয়ে হয়েছিল একটু ডাগর বয়সে, অর্থাৎ তার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে জগতের সকল বস্তুই বুঝতে শিখেছিল। এমনি বয়সে, তার বিবাহ হয় চরহাটার পঞ্চাশ বছর বয়সের জমিদার হরিচরণ গাঙ্গুলীর সঙ্গে।

রমার মার ছিল ফিটের ব্যারাম, বর দেখে তিনি সেই যে শয্যা নিলেন, সে রাত্রের মত আর উঠলেন না।

পরদিন বরকনে বিদায় হ'বার কিছু পূর্ব্বে রমার মা রমাকে তাঁহার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খিল বন্ধ করে দিলেন।

ঘরের এক কোণে অনেক দিনের পুরানো একটা কাঁঠাল কাঠের সিন্ধুক ছিল, রমার-মা আঁচলের চাবির থোলো থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে তাই দিয়ে সিন্ধুকের ডালাটা খুলে ফেলে সিন্ধুকের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর একটা অনেক দিনের ভাঙ্গা পুরাতন

তামার কমণ্ডলুর ভিতর থেকে ভাঁজ-করা এক টুকরা ময়লা বালির কাগজ বার করে রমার মা বল্লেন, "এইটে খুলে দেখ্ দেখি রমা কি আছে।"

রমা দেখলে, সেই অনেক দিনের পুরাণ জীর্ণ কাগজ খানিতে আঁকা রয়েছে তুখানি আলতা-পরা পায়ের ছাপ।

"নমস্কার কর্ রমা, ও হচ্ছে তোর প্রপিতামহীর পায়ের ছাপ; তিনি যখন স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার জন্যে পায়ে আলতা পরেছিলেন, ও হচ্ছে তাঁর সেই সময়কার পায়ের ছাপ; আজ তোকে তোর গরিব-মা যে জিনিষ দিলে, রমা, রাজ-রাজেশ্বরও সে জিনিষ তার মেয়েকে দিতে পারে না।"

সেদিন রমা বুঝেছিল ঐ আলতাপরা পায়ের ছাপ তুখানির ভিতর দিয়ে কত বড় দায়িত্বের বোঝা তার ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার বুকের সব ক'টা পাঁজরকে মোচড় দিয়ে এই কথাটাই ক্রমাগত গুমরে উঠতে লাগলো যে সে কি এতই অপদার্থ! নিজেকে সামলে রাখবার পক্ষে সে কি নিজেই যথেষ্ট নয়? তবে আবার এ রক্ষা-কবচের কি এত দরকার ছিল? হোলই বা বৃদ্ধ স্বামী, তাই বলে কি—? তার বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো।

যে জিনিষটা ভুলবো বলে মানুষ মনে করে সেই জিনিষটাই সব চেয়ে জোর ক'রে বুকের উপর চেপে বসে। রমার হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থা। সে তার স্বামীর বার্দ্ধক্যের কথাটাকে বিশেষ ক'রে ভোলবার চেষ্টা কর্‌তো এবং সেই জন্যেই এই কথাটাই তার

মনে রাত-দিন জেগে উঠতো, যে তার স্বামী বৃদ্ধ। এমনি ক'রে বিধাতা-পুরুষের উপর কারচুপি করতে গিয়ে বার বার টোক্কর খেয়ে যখন সে দেখলে যে বুড়োকে জোয়ান করে তোলা যায় না তখন সে ধরল উল্টোপথ।

যখন 'সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে বুড়োকে জোয়ান ক'রে তোলা যাবে না। তখন সে করল কি? না, জোয়ানকে বুড়ো করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো। স্বামীকে নিজের মতন করে তৈরী করে তুলতে না পেরে সে শেষ কালে নিজেকেই স্বামীর মতন করে গড়ে তুলতে লাগলো। সেই দিন থেকে হঠাৎ সে এমন পাকা গিন্নী হয়ে উঠতে লাগলো যে দেখে শুনে পাড়ার লোকে একবারে অবাক হয়ে গেল।

২

বেলা তখন বারোটা হবে,—তারিণী খেতে বসেছিল আর সুমুখে বসে রমা দেখা শুনা করছিল। তারিণীর স্বভাব ছিল, সে যতক্ষণ খেত ততক্ষণ ক্রমাগত বকতে থাকতো; তা সে কেউ শুনুক আর নাই শুনুক। আজও সে বকছিল, "দেখ বউদিদি, সেদিন এক ব্যাটা পেশোয়ারী পালোয়ান এসেছিল, ওঃ তার কি চেহারা বৌদি; তুমি বরং মাধুরীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো—"

সে আরো কত কি বল্‌তে যাচ্ছিল, রমা কথাটাকে শেষ কর্‌তে না দিয়েই বলে উঠল, "ওসব হাড়-জ্বালানো কথা আমি শুন্‌তে চাই না; ওরকম ক'রে যার তার সঙ্গে কুস্তি লড়া টড়া আর হচ্ছে না, এ আমি এখন থেকে বলে রাখচি; তুমি মনে করছ আমি কিছু টের পাই নি, নয়?—সব টের পেয়েছি।"

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, কোন এক মুসলমান পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়তে গিয়ে গাঙ্গুলীদের মেজবাবু সেদিন এমন

বে-কায়দায় পড়েছিলেন যে, তিন চার মিনিট তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাক্‌তে হয়েছিল। এ খবরটা রমা তাদের পুরাণো চাকর মথুরার কাছ থেকে পেয়েছিল।

কথাটা যে ইতিমধ্যেই রমার কাণে গিয়ে পৌছেছিল তারিণী তা ঘুণাক্ষরেও জানত না—তা হলে কুস্তি বা পালোয়ানদের নাম পর্য্যন্ত রমার কাছে মুখে আনত না। সে আজ সত্য সতই মুস্কিলে পড়ে গেল, কোন রকমে রমার স্বমুখ থেকে সরে পড়তে পারলে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এমনিটা তার মনে হচ্ছিল। পাতের ভাত তার শেষ হয়ে গিয়েছিল ; সে দুধের বাটীটা তুলে নিয়ে চুমুক দেবার উদ্যোগে করছিল, এমন সময় রমা স্বরটাকে একটু নরম করে নিয়ে বলে উঠল, "আর ভাত নিলে না যে বড় ?"

"তবে ছুটি দাও," ব'লে সে দুধের বাটিটা আবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে দিল।

ঠাকুরকে ভাত দিয়ে যেতে বলে এসে রমা আরম্ভ করল, "এমন করলে মানুষ কদিন পারে বল ত ; যদি জিজ্ঞাসা না করতুম তা হ'লে আধপেটা খেয়ে উঠে যেতে ত ; কাল যদি মরে যাই তখন—।"

হুঁ-না কিছু না ব'লে তারিণী লক্ষ্মী ছেলেটির মত ভাতের গ্রাসগুলি একটির পর একটি মুখের মধ্যে পূরে দিতে লাগলো।

তারিণী খেয়ে উঠে গেলে পর যে ঝি সকড়ি নিতে এসেছিল রমা তাকে বল্লে "বাবুকে একবার বাড়ীর ভেতর আসতে বলে আয় ত, বিন্দি !"

হরিচরণ ঘরে প্রবেশ করতেই রমা বলে উঠল, "শুধু জমিদারী দেখলেই হয় না, সংসারও একটু দেখতে হয়।"

"কি দেখতে হবে বল না",—ব'লে হরিচরণ খাটের উপর গিয়ে বসে পড়ল।

"তোমার হাতে ত অনেক ঘটক রয়েছে, তাদের—" কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই হরিচরণ ব'লে উঠল, "তাদের লাগিয়ে দিতে হবে তোমার জন্যে একটি জোয়ান দেখে বর খুঁজে আনবার জন্যে এই ত।"

"দেখ সব সময় ঠাট্টাতামাসা ভাল লাগে না বলছি; তুমি ত আর কচি খোকাটি নও আর আমিও কিছু কচি খুকিটি নই—তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।"

"কার তোমার না আমার?"

"দুজনেরই।"

"বিশ্বাস করতে পারলুম না,—" বলে হরিচরণ এমন ভাবে ঘাড় নাড়তে সুরু করে দিল যে রমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল।

"তুমি না বিশ্বাস করলে ত বড় বয়েই গেল।" ব'লে রমা রাগ করে হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হরিচরণ গিয়ে হাত ধ'রে ফিরিয়ে এনে বল্লে, "আরে পাগল, আমি ঠাট্টা করছিলুম, এটা আর বুঝতে পারলে না,—যাক এখন কি বল দেখি, তারিণীর জন্যে একটি ভাল দেখে মেয়ে দেখতে হবে, নয়?"

রমা কিন্তু কথাটা আর তুল্লে না—সে মুখখনাকে ভার ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

রাত্রে শয্যায় শুয়ে হরিচরণ ডাকল, "রমা—," কোন উত্তর নেই।

আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে হরিচরণ আবার ডাকল, "রমা!" সে বিরক্তভাবে উত্তর দিলে, "আমার শরীরটা আজ ভাল নেই, শুধু-শুধু ডেক না।" হরিচরণ পাশ ফিরে শুলো।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ রমা বিছানার উপর উঠে বসল এবং কোন কথা না বলে স্বামীর পা দুটোর উপর উপুড় হয়ে পড়ে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন করে আমাকে জ্বালিও না।" তার পর সে কি কান্না! সে কান্না আর থামতে চায় না।

হরিচরণ এটা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে, যে দিনই রমাকে সে বুড়োর দল থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, সেই দিনই এই রকম ধরণের একটা-না-একটা কাণ্ড সে বাধিয়ে বসেছে; অথচ এমন ধারণাটা সে যে কেন করে, অত বড় ছুঁদে জমিদার হরিচরণের অত সুক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধিও তার কোন তল্লাস করে উঠতে পারত না।

পরদিন সকালে স্নানাদি সেরে রমা তার মার দেওয়া সেই রক্ষাকবচখানিকে মাথায় ঠেকিয়ে বার বার বলতে লাগল, "ওগো সতীলক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, তুমিই কেবল জান কেন অমন রাতদিন বার্দ্ধক্যকে ডাকছি—আর কেউ তা জানে না।"

৩

বেলা তখন আটটা হবে; আখড়ার আলের উপর বসে তারিণী গায়ের মাটি ঝাড়ছিল আর মুরারি কুস্তির মাটি থেকে কাঁকর বেছে এক জায়গায় জড় করছিল। তারিণী হঠাৎ ব'লে উঠল, "হাঁরে মুরারি, আমি যে সেদিন পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছলুম, এ কথা বৌদিদির কানে কে তুল্‌ল বল্‌ ত?"

"ভগবান জানেন।" ব'লে সে কাঁকর বাছতে সুরু করে দিলে।

কিছুক্ষণের জন্য দু'জনেই নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল; তার পর মুরারি হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা মেজবাবু, তুমি বৌদিদিকে অত ভয় কর কেন?"

"ভয় করি না ছাই করি, ভারি ত বৌদি।"

"তুমি পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছলে,—বৌদিদি তোমাকে খুব বকলে?"

"একটুখানি।"

"তুমি কি বল্লে?"

"আমিও খুব দু'চার কথা শুনিয়ে দিলুম, বল্লুম, মেয়েমানুষের ও সব কথায় কাজ কি ; তুমি যেমন আছ তেমনি থাক।"

"ইস" বলে মুরারী উঠে দাঁড়াল ।

"মাইরি বলছি," বলে তারিণী তার অনাবৃত উরুদেশে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত ক'রে বসল ।

তারিণী বুঝেছিল কথাটাকে আর একটু আগাতে দিলেই সে নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে, কাজেই সে অন্য কথা পেড়ে বসল— "দেখ্ মুরারি, বাঙ্গলার মত জোলো দেশে যতই কেন মেহন্নত কর না, শরীর ঠিক তৈরী হবে না ; শরীর যদি সত্যি সত্যি তৈরী করতে হয় ত কাশ্মীর, মূলতান বা পেশোয়ার ঐ সব অঞ্চলে গিয়ে দিনকতক চেপে থাকতে হয় ।"

"যে পাকা খেলোয়াড় হয় সে কানা কড়িতেই খেলে— শরীর যাহার তৈরী হবে, তার আবার এদেশ-সেদেশ কি ?" ব'লে মুরারি কোদাল দিয়ে মাটিগুলোকে সমতল করে দিতে লাগলো ।

" তা বটে, কিন্তু পোষ্টাই দেশ হলে একটু শীগ্গির হয় ।"

মুরারি কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে উঠিল, "সেজবাবু আসছে না ?"

দরমার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে তারিণী ব'লে উঠল, "শ্যামই ত বটে, সঙ্গে আবার চার পাঁচটি ইয়ারও রয়েছে, বোধ হয় ভোরের ট্রেণে এসেছে ।"

কিছুক্ষণ পরেই শ্যামবাবু এবং তাঁর বন্ধু ক'টি আখড়ার মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

তারিণী বা মুরারির দিকে লক্ষ্য না করেই শ্যাম তার নিকটস্থ বন্ধুটিকে বলতে লাগল, "এইটি হচ্ছে আখড়াবাড়ী, এখানে পালোয়ানেরা সব কুস্তি টুস্তি লড়ে; বাইরে থেকে মাঝে মাঝে বড় বড় পালোয়ানেরা সব এখানে এসে ল'ড়ে যায়"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছিপ্ ছিপে পাতলা বথা গোছের একটি ছোকরা হনুমান-জীর মূর্ত্তিটিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, "এটি কি?"

অপর একটি ছোকরা বলে উঠল, "ওটি হচ্ছে তোমার Statue." সকলে হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

শ্যাম এবং তার বন্ধুরা সকলে চলে গেলে মুরারি বলে উঠল, "আচ্ছা মেজবাবু, এরা সব মেয়ে মানুষ না বেটা ছেলে?"

"কেন বল্ দেখি?"

"পুরুষমানুষে না কি আবার অমন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কয়, অমন ঢং করে চলে?"

"তুই ওদের এক জনকে বিয়ে করে ফেল্ না", বলেই তারিণী এমন বিকট শব্দে হেসে উঠলো, যে মুরারি পর্য্যন্ত হঠাৎ চমকে উঠলো; সে মনে করেছিল, না জানি কি ভয়ানক রসিকতাটাই সে আজ করে ফেলেছে।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তারিণী আর মুরারি গঙ্গার ধারে ব'সে গল্প করছিল, এমন সময় মতি সেঁকরার ব্যাটা মদ্‌না ছুটতে

ছুটতে এসে খবর দিলে যে তার বড় ভাই জটাধারীকে সেজবাবু এবং তাঁর কলকাতার বন্ধুরা মিলে তেমাথানির কাছে ফেলে ভয়ানক মারছে। তেলীদের ছোট বৌ জল তুলে ফিরছিল, বাবুরা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নানান রকম বিশ্রী কথা বলছিলেন —জটাধারী কেবল এই কথাটি বলেছিল, এমন ধারা করতে নেই; এই তার অপরাধ।

তারিণী এবং মুরারি যখন ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো তখন পর্য্যন্ত পুরা দমে প্রহার চলছিল, বেচারার সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে রক্ত ঝরছিল। রাস্তায় অনেক লোক জড় হয়ে ছিল কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করছিল না; হাজার হোক কলকাতার ছেলে, তার উপর আবার সেজবাবুর বন্ধু।

তারিণী এসেই যে ছোকরাটি জটাধারীর বুকে চেপে বসে-ছিল তার টুঁটিটা ধরে বিড়ালছানার মত তুলে ধরলে এবং সে, কিছু বলবার পূর্ব্বেই এমন একটি ধাক্কা তাকে দিয়ে বসল যে সে বেচারা টাল সামলাতে না পেরে রাস্তার ধারে যে খানা ছিল তারি মধ্যে গিয়ে পড়ল।

শ্যামবাবু তার মেজ দাদাকে কি বলতে যাচ্ছিল, তারিণী তার গালে এমন একটি চপেটাঘাত বসিয়ে দিলে যে তার আর বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না।

অপর বন্ধু ক'টিরও ঠিক ঐ দশা হলো; কেউ খানায় পড়লো, কেউ ডোবায় পড়লো, কারুর জামা ছিঁড়ল, কারুর নাক কাটলো —মোট কথা চক্ষের নিমিষে একটা প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে তারিণীকে ডেকে হরিচরণ খুব কড়া স্বরে বললেন, "হ্যাঁরে, তুই শ্যামের বন্ধুদের মেরেছিস।

সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রহিল। দাদার মুখের উপর সে কোন দিন কথা বলতে পারত না।

হরিচরণ আবার বল্লে, "কেন মেরেছিস বল্ না গাধা?"

সে তেমনি ভাবেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"বসে বসে খেয়ে গায়ে বড় তেল হয়েছে নয়; তোমার পালোয়ানী আমি ঘোচাচ্ছি, রোসো।"

তারিণী ভাত খেতে যেতেই রমা বলে উঠল, "তোমার জ্বালায় কি আমাকে দেশত্যাগী হ'তে হ'বে ঠাকুরপো? তুমি দিন দিন একটি গুণ্ডা হয়ে উঠছো দেখছি।

তারিণী সেই সবে ভাতে হাত দিয়েছে,—তার হাত থেমে গেল; সে চুপ করে বসে রইল; তার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রুধারা ভাতের থালার উপর ঝরে পড়তে লাগলো।

রমা তারিণীর হাত দুটোকে ধ'রে ব'লে উঠল, "মাথা খাও ঠাকুরপো, অমন ক'রে ভাতের থালা কোলে ক'রে কেঁদ না, আমি আর কখন তোমাকে বক্‌ব না।"

তারিণী প্রকৃতিস্থ হ'লে রমা বল্লে, "এযে তোমার অন্যায় রাগ ঠাকুরপো, দোষ করলে বকবো না; আজ যদি আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ বেঁচে থাকতেন তা হলে তিনি বকতেন না? আমি তোমাকে পেটে ধরিনি বৈ ত নয়।"

তারিণী বল্লে, "তুমি ত আমাকে কতদিন বকেছ আমি কি

কোন দিন রাগ করেছি? আজ যে তুমি শুধু-শুধু বকলে তাই ত—”

“শুধু শুধু ত বকিনি ঠাকুরপো; তুমি নাকি তাদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছ?”

“কেন দিয়েছি তা ত জান না।”

“না বল্লে কেমন ক’রে জানব বল।”

সব কথা খুলে বলবার জন্যে রমা তারিণীকে অনেক সাধ্য সাধনা করতে লাগলো, সে কিন্তু কিছুতেই কোন কথা বল্লে না। তার পর মুরারিকে ডেকে তার মুখে যখন সকল কথা শুনল তখন সে একবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল! হরিচরণকে ডেকে সে বল্লে, “এ বাড়ীতে আর একদণ্ড থাকবো না; তুমি এখুনি আমার জন্যে পাল্কী ডাকিয়ে দাও।”

সেই দিন সন্ধ্যার সময় শ্যামকে ডেকে হরিচরণ বল্লে, “ছাখ্, তোর ঐ ইতর বন্ধুদের এখুনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে দিগে যা। কাল সকালে উঠে যদি শুনি ওরা যায় নি ত সব ব্যাটাকে ধরে জেলে দোবো, এ আমি বলে রাখছি—এখানে ওসব ইতরামি খাটবে না।”

৪

গাঙ্গুলীদের প্রকাণ্ড বসতবাটীর ঠিক গায়েই ছিল ঠাকুর-বাড়ী ; মাঝখানে ছিল যাবার আসবার একটা সরু পথ।

রমা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দেবালয়ে আরতি দেখতে আসতো।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরের একদিকের একটা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রমা আরতি দেখছিল। পুরোহিতঠাকুর আরতি করছিলেন ; সুন্দর সুঠাম গৌরবর্ণ এই তরুণ ব্রাহ্মণটি প্রতিদিন গাঙ্গুলীদের ঠাকুরবাড়ীতে আরতি করতে আসতো এবং আরতি শেষ হ'য়ে গেলে সান্ধ্যভোগের প্রসাদ গামছার খুঁটে বেঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরে যেত।

আরতি শেষ হয়ে গেলে পুরোহিত ঠাকুর রমার দিকে চেয়ে বল্লে, "বৌদিদি, আমি বোধ হয় পাঁচ সাত দিন আসতে পারবো না, সে ক'দিনের জন্যে আর একটি জানাশোনা বামুনের ছেলেকে দিয়ে যাবো—সে রোজ এসে পূজো করে যাবে।"

"তা না এস ক্ষতি নেই, কিন্তু এক কথা তোমাকে ব'লে

রাখি, তুমি আর কখনও আমাকে বৌদিদি বলে ডেকো না; ডাকবার দরকার হয় ত মা বলে ডেকো, বুঝলে?" কথাটা শেষ করেই রমা ঝড়ের মত মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ সেদিন সত্য সত্যই বড় অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। তারিণীর সঙ্গে সে ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়ত, সেই সূত্রে সে রমাকে বৌদিদি বলে ইস্তকনাগাদ ডেকে এসেছে, আজ বৌদিদি ব'লে সে যে কি এমন অপরাধটা ক'রে বসল তা সে বুঝতে পারল না।

পরদিন সকালবেলা তারিণীকে ডেকে রমা বল্লে, "আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করছি, এবার যদি আবার সেবারকার মতন কেলেঙ্কারি কর ত, আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো, এ আমি বলে রাখছি আগে থাকতে।"

মাথা চুলকে, হাত কচ্‌লে তারিণী বল্লে, "আর যা বলবে শুনব বৌদি, ঐটি কেবল—"

"আমি কোন কথা শুনতে চাই না; বুড়ো হাড়ে আর কতদিন এমন করে খাটবো? একটি ছোটখাট বৌ না হ'লে আমি আর একা সংসার করে উঠতে পারছি না।"

রাত্রে হরিচরণ শুতে এলে রমা বল্লে, "বুড়ো বয়সে একটি ছোট বৌ নিয়ে দিন কতক সাধ আহ্লাদ করব, তা দেখছি তোমরা হ'তে দেবে না।"

হরিচরণ বল্লে, "বেশ ত কালই ঘটক লাগিয়ে দিচ্ছি—দেশে মেয়ের অভাব না কি।"

কিছুদিন পর একদিন তুপুর বেলায় তারিণী খাওয়া দাওয়া

সেরে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল, এমন সময় রমা সেই ঘরে প্রবেশ করল, সঙ্গে তার একটি গোলগাল ছোট মেয়ে।

ঘরে প্রবেশ করেই রমা বল্লে, "আমার মাথার দিব্যি ঠাকুরপো, অমত কোরো না,—এমন মেয়ে আর পাবে না।"

তারিণী মহামুস্কিলে পড়েছিল—সে কি বলে? এদিকে রমাও নাছোড়-বান্দা—শেষকালে তারিণীকে রাজী হতে হলো।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মুরারিদের দরজার কাছ থেকে তারিণী ডাক দিল, "মুরারি বাড়ী আছিস্?"

সে বেরিয়ে আসতেই তারিণী বল্লে, "নে, তৈরী হয়ে নে, এখুনি কাশী যেতে হবে।"

"সে কি?"

"যা বলি তাই শোন্ না।"

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।"

"বুঝেও দরকার নেই।"

"বাড়ীতে একবার ব'লে আসি।"

"তবে তুই থাক্, তোর গিয়েও কাজ নেই।"

"ভাব্‌বে যে।"

"সে বন্দোবস্ত না ক'রে যাচ্ছি না; আমার শোবার ঘরের বিছানার উপর বৌদিদির নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছি, তাইতে সব কথা লেখা আছে।"

"কাশী যাচ্ছ তাও লিখে এসেছ নাকি?"

"আমি এমনি গাধা কি না।"

সেই দিনই রাত্রে তারিণীর সেই কাগজের টুকরাটা রমার হাতে পড়লো—সে কিছু বল্লে না, আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকল কথা শুনে হরিচরণ বল্লে, "তোমার আদরেই ত ও অত বেড়ে উঠেছে।"

রমা ফোঁস করে উঠলো, "তার জন্যে ত কাউকে ভুগতে হচ্ছে না; আমি বেশ করব, আদর দোবো, খুব করব আদর দোবো।"

৮

আজ প্রায় মাসখানেক হ'তে চল্ল তারিণী বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

বাগানের দিকের খোলা বারান্দায় রমা চুপ করে বসেছিল; হাতে তার কোন কাজই নেই। জীবনটা তার নেহাইৎ এক-ঘেয়ে হয়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল; কিছু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, আকাশ তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'য়ে যায় নি, একটা নীরব অবসাদের ভাব প্রকৃতির বুকখানা জুড়ে বসেছিল, রমা অন্যমনস্কভাবে বাগানের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিল! সমস্তই তার কাছে আজ কেমন যেন ফাঁকাফাঁকা ঠেকছিল। তার জীবনটা কি ভয়ানক একটা বিড়ম্বনা! আজ চুল বাঁধবার সময় সে আরসিতে নিজের মুখখানা দেখে সত্যই চমকে উঠে-ছিল; এমন করে মানুষ যে কখন নিজের যৌবনকে জোর জবরদস্তি করে তুমড়ে মুচড়ে বিকৃত করে ফেলে এমন ধারা ঘটনা বুঝি বিশ্বদুনিয়ার কোন ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। তার কান্না আসতে লাগলো।

এই সময় আবার দেবালয়ের নহবৎখানা থেকে পূরবীর একটা তান সন্ধ্যার সেই ঝিরঝিরে বাতাসে করুণ হ'য়ে ভেসে আসছিল, সে যেন কেবলি কান্না—আর কান্না; সে যেন কেবলি বলতে চায়, "ব্যর্থ, সব ব্যর্থ।"

হরিচরণ এসে আস্তে আস্তে ডাকলে, "রমা, ও রমা।"

বাগানের দিকে চেয়েই রমা উত্তর দিলে, "কেন?"

"আরতি দেখতে যাবে না?"

"না।"

"কেন?"

"ওসব আর ভাল লাগে না।"

"তারিণীর জন্যে তোমার বড্ড মন কেমন করছে নয়, রমা?"

"তুমি তার বড় ভাই, তোমার মন কেমন করছে না, আমার করবে?"

"তুমি যে তাকে পেটের ছেলের মতন ক'রে ভালবাসতে, রমা।"

"ভুল করেছিলুম, আজ তার জন্যে আপশোষ করছি; নিজের ওপর অমন ক'রে অত্যাচার আর কখন করব না; কেন কিসের জন্যে?"

"আমি ত বরাবরই তোমাকে সে কথা বলে এসেছি রমা।"

"যাও, মিথ্যে আর বকিও না",—ব'লে রমা চুপ ক'রে ব'সে রইল! হরিচরণ আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল।

* * *

কাশীতে গিয়ে তারিণীরা যে বাড়ীতে উঠেছিল তারি নীচের

তালায় থাকত এক ঘর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের সংসারে থাক্‌বার মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ নিজে, ব্রাহ্মণী, আর বার তের বছরের একটি ছোট মেয়ে।

বেলা তখন আটটা হবে, তারিণী গঙ্গাস্নান ক'রে বাড়ী ফিরে দেখে, ব্রাহ্মণী মেয়েটাকে ভয়ানক মারছে আর মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে তাই সহ্য করছে, মুখে একটি কথা নেই, কেবল চোখদুটি দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে অনেক কষ্টে সে যাত্রা মেয়েটাকে ব্রাহ্মণীর হাত থেকে রেহাই দিতে পেরেছিল।

মুরারি তখন পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছিল, আগের দিন রাত্রে তার জ্বর হয়েছিল। তারিণী উপরে এসে একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়ে বল্লে, "তুই ত এখানে ষাঁড়ের মতন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস আর নীচে যে বাম্‌নীবুড়ী মেয়েটাকে একেবারে আধ-মরা করে ফেল্লে, তাকি একবার উঠে দেখতে নেই? ভাগ্যিস, আমি এসে পড়েছিলুম, তা না হলে মেয়েটাকে ত মেরেই ফেলেছিল।"

চোখ কচলাতে কচলাতে শয্যার উপর উঠে ব'সে মুরারি বল্লে, "তা আমি আর কি করব বল? অমন ধারা ত রাতদিনই হচ্ছে; কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বইত নয়।"

"কুড়িয়ে পাওয়া কি রকম?"

"ঐ রকমই ত শুনলুম।"

"কে তোকে বল্লে?"

"কেন বামুন ঠাকুর নিজেই।"

করুণায় তারিণীর বুকখানা একবারে ভরে উঠল। ব্রাহ্মণ বাড়ী আসতেই তারিণী তাকে সকল কথা বল্লে। সে বল্লে, "কি করব বল বাবা, আমি ও মাগীকে ঢের মানা করেছি, ওকি শোনে; এখন মেয়েটাকে কোন রকমে পাত্রস্থ করতে পারলে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

"তা পাত্রের সন্ধান করুন না।"

"পাত্র বল্লেই ত পাত্র আসে না, বাবা; কে ওকে বিয়ে করতে যাবে বল?"

"কেন?"

"কুল শীল যে ওর কিছুই জানা নেই।"

"তারিণী কিছুক্ষণ চুপ করে ব'সে রইল, তার পর হঠাৎ বলে উঠল, "কুছ পরোয়া নেই, আমি ওকে বিয়ে করব।"

৬

বেলা তখন প্রায় দশটা হবে, শীতকালের মোলায়েম রৌদ্র-টুকু বারান্দার উপর এসে পড়েছিল, রমা সেইখানটিতে বসে চুল শুকোচ্ছিল।

অদূরে গোয়ালঘরে একটা গরু থেকে থেকে করুণভাবে ডেকে উঠছিল, আগের দিন রাত্রে তার বাছুরটি মারা গেছে। রমা চুপ করে বসে বসে তাই শুনছিল। বারান্দার ঠিক নীচেই পুকুর ধারে গোয়ালারা একটা খড়পোরা নকল বাছুরকে সুমুখে ধরে গাভীটাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিল, রমা বসে বসে তাই দেখছিল। আজকের প্রভাতটা তার কাছে যেন বিশ্বসৃষ্টির মাঝখানকার একটা অতি বড় গোপনীয় রহস্যের মত ঠেক্‌ছিল, তার মনে হচ্ছিল, এই দুনিয়াটা একটা খড়পোরা একটা বিরাট প্রতারণা—এর মধ্যে কিছু নেই, আছে শুধু খড় আর ফাঁকি।

হঠাৎ সেইখানে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হিরে ঝি খবর দিলে,—মেজবাবু কোথা থেকে কাদের একটা মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ী ফিরেছেন।

"আমাকে কোন কথা শোনাতে আসিস্ না তোরা," বলে রমা তেমনি ভাবেই বসে রইল।

তারিণী বিয়ে ক'রে বাড়ী ফিরেছে—তাতে আর হয়েছে কি? এমন ধারাটা ত হতেই পারে; রমার কাছে এটা আজ কিছুমাত্র নূতন বলে মনে হোল না; আজ তার কাছে তুনিয়ায় কোন বস্তুই বিচিত্র বলে মনে হচ্ছিল না—সবই যেন পুরাতন, সবই যেন দেখা-দেখা।

প্রায় আধঘণ্টা পরে রমার হঠাৎ চমক ভাঙ্গল—সে যেন এতক্ষণ জেগে স্বপ্ন দেখছিল।

রান্নাঘরে যেতে হলে তারিণীর ঘরের সমুখ দিয়ে যেতে হোতো; রমা তারিণীর ঘরের কাছ বরাবর এসে কি মনে করে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে তারিণী বলে উঠলো "জাত যাবে না বৌদিদি! ভয় নেই।" সে আরো কত কি বলতে যাচ্ছিল, রমা এক নিশ্বাসে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সে আবার বারান্দায় এসে বসে পড়ল। আজ বিশ্ব তুনিয়ার মধ্যে এই বারান্দাটাই তার কাছে সব চেয়ে সত্য বলে মনে হচ্ছিল, আর সব মিথ্যা, আর সব ফাঁকি।

গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল, গাঙ্গুলীদের মেজবাবু নাকি কোথা থেকে একটা চাঁড়ালের মেয়ে বিয়ে করে ঘরে ফিরেছে।

হরিচরণ একজন পুরাণো সেরেস্তাদারকে দিয়ে বলে পাঠালেম যে, তার সঙ্গে গাঙ্গুলীবংশের ভবিষ্যতে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

তারিণী বল্লে "বয়েই গেল।"

ঘরে ঢুকে সে তার নব পরিণীতা স্ত্রীকে বল্লে, "তোমার বাবা ঠিকই বলেছিলেন, দেইজি চিরকাল দেইজিই থাকে।"

তারিণী আজকাল আর সে তারিণী নাই। সে কুস্তি লড়া ছেড়ে দিয়েছে, মাটি মাখা ছেড়ে দিয়েছে। মুরারি দিনের মধ্যে সাতবার এসেও তার দেখা পায় না।

কাশী থেকে আসবার সময় বামুনঠাকুর তাকে বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছিল, "জমীদারের কাণ্ড, দেখো বাবা কেউ যেন মেয়েটাকে বিষ খাইয়ে না মারে।" তারিণীর হয়েছিল সেই ভয়। সে রাত দিন আগ্‌লে বসে থাকত।

৭

আজ প্রায় এক মাস হতে চল্ল তারিণী বাড়ী ফিরে এসেছে, এই দীর্ঘ একটা মাসের মধ্যে একটিবারের জন্যও রমা তার কোন সংবাদ নেয় নি। তারিণী আলাদা থাকত, আলাদা খেত। তার রান্নাঘর হয়েছিল আলাদা, ভাঁড়ার হয়েছিল আলাদা এবং আলাদা একটি পাচকও রেখেছিল।

বসন্তকালের সন্ধ্যা, বাগানের গাছপালাগুলো ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় একবারে ভরে উঠেছে সবই যেন পরিপূর্ণ, সবই যেন প্রচুর। রমা নিজের ঘরের জানালার ধারে বসেছিল; একটা ফুরফুরে বাতাস চাঁপার তীব্র গন্ধ গায়ে মেখে মাতালের মত জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিল;—আজ একমাস পরে হঠাৎ রমার আরতি দেখতে যাবার ইচ্ছা হল।

তখন পুরোহিত ঠাকুর আরতি করছিলেন, রমা এসে মন্দিরের দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল।

আরতি শেষ হয়ে গেলে রমা ঠাকুর প্রণাম না করেই মন্দির থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

আপনার শয়নকক্ষে এসে সে তার মায়ের দেওয়া সেই

রক্ষাকবচখানিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, "ওগো সতী লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, আমাকে বাঁচাও আমি মরতে বসেছি।" সে বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

রাত্রে ঘরে শুতে এসে হরিচরণ ডাকল—"রমা।"

"কি?" তার গলার স্বর তখন পর্য্যন্ত ভার-ভার।

"ওকি তুমি কাঁদছিলে নাকি?"

রমা ছোট মেয়ের মত করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বাঁচাও।"

রাত তখন শেষ হয়নি, অল্প অল্প ফরসা হয়ে আসছে; রমা শয্যা ছেড়ে উঠে একেবারে তারিণীর ঘরের দরজায় ঘা দিতে স্থরু ক'রে দিলে।

দরজা খুলে দিয়ে তারিণী কি বলতে যাচ্ছিল, রমার মুখের দিকে চেয়ে সে চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে জোর করে কান্নার বেগকে বুকের মধ্যে চেপে রাখলে হঠাৎ সে যেমন দম ফেটে বেরিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি করে রমা চীৎকার করে উঠলো, "এমনি করেই মাতৃ-ঋণ শোধ করতে হয় নয়, ঠাকুরপো?"

তার পর ঘুমন্ত নূতন বৌয়ের চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে বিছানার উপর বসিয়ে দিয়ে, সে আবার চীৎকার ক'রে উঠলো, "একটিবার গিয়ে পায়ে ধরলে তোর কি এতই অপমান হোতো, পোড়ারমুখী?"

তার পরই সে কি কান্না! মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে রমা ছোট মেয়ের মত গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারিণী রমার পা দুটোকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি, আমাকে এবারটা শুধু মাফ কর।"

উঠে দাঁড়িয়ে তারিণীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে রমা বলে উঠলো, "তোমাদের মাফ করব না ত কাকে মাফ করব, ঠাকুরপো? তোমরাই যে আমার সব, তোমরাই যে আমার নারায়ণ, তাই তোমরা যেদিন ছেড়ে গেলে সেদিন থেকে কত পাপই একে একে বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছে। এতদিন পর তোমাদের চিনেছি ঠাকুরপো, এখন তোমরা তাড়িয়ে দিলেও আর যাচ্ছি না।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রমা এসে নূতনবৌকে ডাকলে "চল বোন, আরতি দেখে আসিগে।"

আজ তার বুকে এতটুকু সঙ্কোচ নেই; সে যে আজ শ্বাশুড়ীর দায়িত্ব মাথায় ক'রে দেবালয়ে যাচ্ছে, আজ যে তার কোন দিকে তাকাবার অবসর নেই।

